সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

আগস্ট ২০১৫

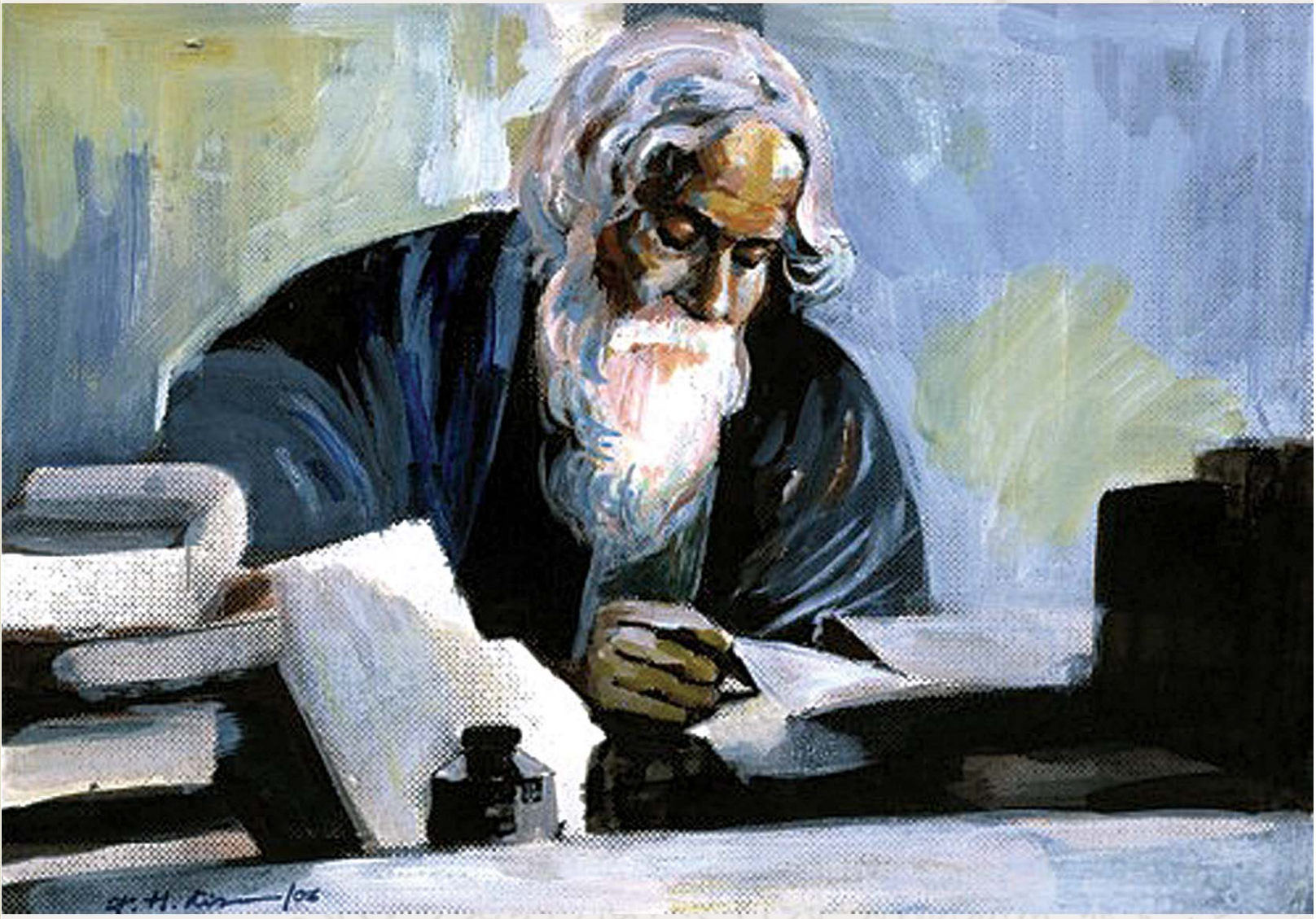

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ...

আনন্দের মুহূর্ত– দীর্ঘ ৬৮ বছর পর অমীমাংসিত ছিটমহল বণ্টন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ তেতালিশ | সংখ্যা ০৮ | শ্রাবণভাদ্র ১৪২২ | আগস্ট ২০১৫

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre
Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

অচেনা সুন্দরীর ট্র্যাজিক ম্যাজিক

বরেন্দ্র অঞ্চলে নজরুল

সূচিপত্র

রবীন্দ্রভাবনায় ইউরোপ বনাম এশিয়া ০৪
ভ্রমণদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ০৮
অচেনা সুন্দরীর ট্র্যাজিক ম্যাজিক ১২
ছোটগল্প: হাঁটাবাবা ১৭
বরেন্দ্র অঞ্চলে নজরুল ২০
কবিতা ২৪
প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ ২৬
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ৩০
ধারাবাহিক: রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ৩৩
শিশুতীর্থ: পাঠশালা ৩৯
রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ৪২
অনুবাদ গল্প: ছেঁড়া চাদর ৪৫
শেষ পাতা: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮

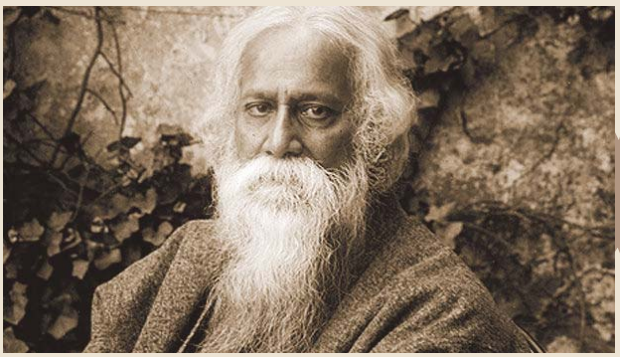

৪২

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

একটি কবিতা কীভাবে একজন কবির প্রতিভাকে নবতর চেতনায় বিকশিত করে পুরো জীবনকে আলোড়িত করতে পারে, বৈশ্বিকভাবনায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত। বিশ্বকবি আর বিদ্রোহীকবির মধ্যে কি অদ্ভুত মিল! দু'জনেরই বয়স তখন বাইশ, কবিতা দু'টি রচিত হয়েছিল জীবনের বিশেষ মুহূর্তে। কলকাতায় খুব কাছাকাছি কবিতা দু'টির জন্ম; উভয়ের নতুন জন্মলাভ। একটি সদরস্ট্রিটে, অন্যটি তালতলায়। উভয় কবিতার মূলসুর বিদ্রোহব্যঞ্জনার অনুরণন। সারা জীবনের সাহিত্যসাধনাগত এষণা। বাংলা সাহিত্যে এ দু'জন কবির মত স্রষ্টা আর সৃষ্টির এমন অভূতপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত তেমন দেখা যায় না।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮০২৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

এক অসাধারণ যোগ সংখ্যা

আধুনিক এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় 'সিনথেটিক' মেডিসিনের যেমন অনেক সুফল রয়েছে তেমনি নানাবিধ কুফল বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে। এই মেডিসিন যেমন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে সহায়তা করে, তেমনি এর উপজাত হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে এমনকি স্বল্পমেয়াদেও একটি রোগ সারাতে গিয়ে আরেকটি রোগকে আমন্ত্রণ জানায়। যেমন কিছু কিছু মেডিসিন খেলে এ্যাসিডিটি কিংবা পেটে গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াস্বরূপ। তাই ডাক্তাররা ওই ওষুধের সঙ্গে গ্যাস কিংবা এ্যাসিডিটির ওষুধটি রোগীকে। অতএব আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি যতই উন্নত হোক না কেন, কিছু ত্রুটি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে বরাবর। তাই সারাবিশ্বে আধুনিক সচেতন মানুষেরা ঝুঁকে পড়ছেন বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা তথা বিকল্প ওষুধের ওপর। যোগ, ধ্যান, এ্যারোবিক্স, আকুপাঙ্চার, আকুপেসার বিকল্প ওষুধ হিসেবে আজ প্রায় সারাবিশ্বেই প্রসারতা লাভ করছে। *ভারত বিচিত্রা* জুন ২০১৫ বিশেষ যোগ সংখ্যাটি এক্ষেত্রে এক মহামূল্যবান প্রামাণ্য দলিল বলে পরিগণিত হতে পারে। প্রথমেই আমি সম্পাদক এবং ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এই অমূল্য সংখ্যাটি পাঠকদের উপহার দেবার জন্য। সংখ্যাটি পড়ে যোগ সম্পর্কে যাদের সম্যক ধারণা আছে তাঁরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি যোগ সম্পর্কে যাঁরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নন– তাঁরাও খুঁজে পাবেন এক নতুন দিগন্তের সন্ধান যা হয়তো তাঁদের জীবনটাকেই পুরো পাল্টে দিতে পারে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিটি নিবন্ধনই এক কথায় শুধু অনবদ্যই নয় অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ এবং জ্ঞানগর্ভও বটে। শুধু যোগের উপকারিতা বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে বলেই নয় বরং যোগ সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য জানতে পেরে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি। আমি সংখ্যাটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং সেই সঙ্গে হাই কমিশন কর্তৃপক্ষকে আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

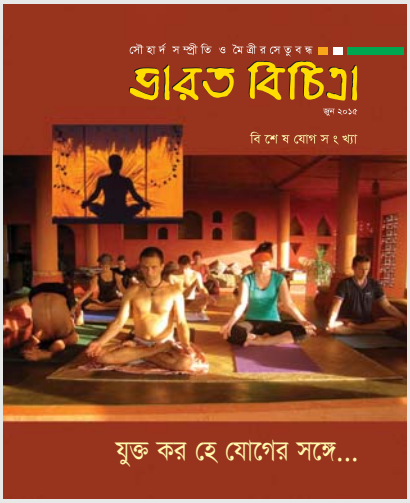

শিপ্রা ঘোষ
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা

বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ

আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রশি ৰকগণ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বন্ধুপ্রতিম ভারতের জনগণ, বর্ণাঢ্য ইতিহাসঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে *ভারত বিচিত্রার* সৌজন্য কপি ইস্যু করা হলে আমরা ভারত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

মো. আবুল হোসেন, প্রধান শিৰক
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়
শাহজিবাজার, মাধবপুর, হবিগঞ্জ

কৃতার্থ করবেন

আমি জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক এবং পাশাপাশি কলেজ লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছি। উলেখ, এই কলেজে ২৯৬ জন ক্যাডেট পড়াশোনা করছে। ক্যাডেটদের জ্ঞানার্জনের একটি বড় জায়গা হচ্ছে লাইব্রেরি। আমাদের লাইব্রেরিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন রকমের প্রায় সাত হাজার বই রয়েছে। এ ছাড়া এখানে নিয়মিত সাহিত্যপত্রসহ জ্ঞানবি জ্ঞানের নানা শাখার বিভিন্ন প্রকার পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আপনার স্বনামধন্য *ভারত বিচিত্রা* পত্রিকাটি শিৰকসহ ক্যাডেটদের দারুণ পছন্দের হলেও তা এখানে সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় আপনি যদি উক্ত পত্রিকাটি দুই কপি করে আমাদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন, তাহলে আমরা উপকৃত হই। পত্রিকাটি পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করবেন।

মুহা. কামরুল হাসান রোকন প্রভাষক
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কলেজ লাইব্রেরি
জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ

অশেষ আনন্দ লাভ করেছি

আপনাদের প্রকাশিত ভারত বিচিত্রা পাঠ করে আমরা অশেষ আনন্দ লাভ করেছি। ভারতবর্ষকে জানতে এবং এর সনাতন ধর্ম, শিক্ষাসংস্কৃতি, শিল্পসাহিত্য, জ্ঞানবি জ্ঞান প্রভৃতির পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভে এর তুলনা নেই। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় অবস্থিত 'পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রম'এ সুবিশাল গ্রন্থাগারসহ সংস্কৃত কলেজ ও অন্যান্য জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সম্প্রতি এখানে 'শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সংস্কৃত ও সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়'এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মেধাবিকাশের এই কার্যক্রমে *ভারত বিচিত্রা* একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের বৃহৎ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাঠাগারের জন্য ২ কপি (এক কপি লাইব্রেরিতে পাঠের জন্য ও আরেক কপি বাঁধাই সংরক্ষণের জন্য) পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রেরণ করলে আমরা উপকৃত হব। আরও আবেদন রাখি, অতীতে প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রার* কপি পেলে আমরা তাও সংগ্রহ করে বাঁধিয়ে আমাদের লাইব্রেরিতে রাখতে পারি।

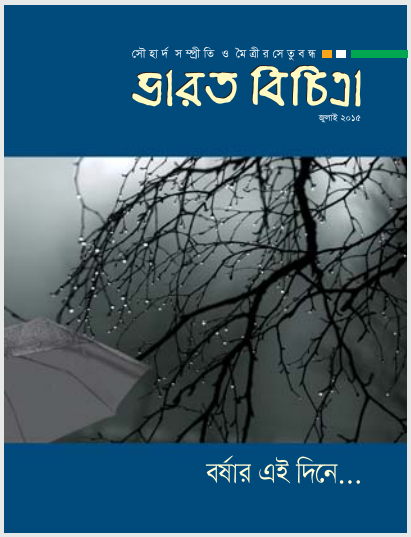

শ্রীযুত অনাদিমোহন মণ্ডল শর্মা
আশ্রম অধ্যক্ষ, সৎসঙ্গ আশ্রম
গ্রাম: দেড়ুলী, ডাক: সৎসঙ্গ দেড়ুলী
খুলনা-৯২৫৩

অনুপ্রেরণা যোগাবে

অনুপ্রাস জাতীয় কবি সংগঠন তিন দশক যাবত বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় পদযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে আধুনিক সমাজ-রাষ্ট্র, ব্যবসায়বা ণিজ্য তথা সমকালীন সাহিত্যচর্চায় শিল্পীসাহিতি ্যকদের মননশীল কাজে নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

এ অগ্রযাত্রাকে গতিশীল করার লৰ্যে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা অব্যাহত রাখতে পারবে। ানুপ্রাস জাতীয় কবি সংগঠনের শিল্পসং স্কৃতির এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য আপনাদের প্রকাশিত ভারত বিচিত্রার দুটি কপি সৌজন্য হিসেবে নিয়মিত পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

শেখ সামসুল হক
নির্বাহী সভাপতি
অনুপ্রাস জাতীয় কবি সংগঠন
এ২ বাণিজ্য বিতান সুপার মার্কেট (২য় তলা)
ইস্ট কর্নার, নীলৰেত, ঢাকা ১২০৫

সম্পাদকীয়

পশ্চিমা কবি এপ্রিলকে নিষ্ঠুরতম মাস বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। নানা বিবেচনায় ভারতবর্ষে আমরা আগস্টকেই বরং নিষ্ঠুরতম মাস বলতে পারি। এই আগস্টের এক বৃষ্টিস্নাত দিনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন। এই মাসেরই ১৫ তারিখে সপরিবারে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মাসেই আমাদের চিরদুঃখী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। আবার এই আগস্টেই ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি, আমাদের সমসাময়িককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ বিজ্ঞানী আবুল পাকির জয়নুল আবেদীন আবদুল কালাম ভারতবাসীকে তো বটেই, বিশ্ববাসীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে চির বিদায় নিলেন। গান্ধীজীর নৃশংস খুনের প্রতিক্রিয়ায় বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'যুগের পর যুগ চলে যাবে, তবু আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, এমন একজন মানুষ একসময় এই পৃথিবীতে হেঁটে-চলে বেড়াতেন...'। এপিজে আবদুল কালামের মৃত্যুতে সেরকম এক অনুভূতি আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। আমরা অনুভব করি, খুব প্রিয় একজন মানুষকে আমরা চিরতরে হারালাম।

কী অভূতপূর্ব উত্থান এই মানুষটির। রূপকথার রাখালরাজা বুঝি-বা মূর্ত হল তাঁর মাঝে। হতদরিদ্র মাঝির এই ছোট্ট ছেলেটি রাত থাকতে উঠে পড়তে যেতেন অংক শিক্ষকের কাছে। বছরে মাত্র পাঁচজন ছাত্রকে এই শিক্ষক বিনা বেতনে পড়াতেন। ছেলেটি সেই পাঁচজনের একজন। তাঁর মা আরো ভোরে উঠে তাঁকে স্নান করিয়ে তৈরি করে দিতেন। সাড়ে পাঁচটার দিকে বাড়ি ফিরে ছুটতেন তিন কিলোমিটার দূরের রেলস্টেশনে খবরের কাগজ সংগ্রহ করতে। যুদ্ধের সময় বলে স্টেশনের ট্রেন থামত না, চলন্ত ট্রেন থেকে খবরের কাগজের বান্ডিল সংগ্রহ করে বাড়ি বাড়ি বিলি করা ছিল তাঁর কাজ। সেই কাজ সেরে সকাল আটটায় ঘরে ফিরলে মা তাঁকে খেতে দিতেন– অন্যদের থেকে একটু বেশিই দিতেন তাঁকে, তিনি যে একইসঙ্গে পড়া আর কাজ করেন। তারপর স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে আবার শহরে যেতেন লোকজনের কাছ থেকে বকেয়া আদায় করতে। সেই বয়সে তাঁর দিন কাটত শহরময় হেঁটে, দৌড়ে আর পড়াশুনো করে। একদিন বড়ভাই তাঁকে ডেকে বকলেন, কালাম তুই যে বেশি রুটি খাস সেতো মায়েরই ভাগ থেকে। মাকে রোজ আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। তোর লজ্জা করে না...। সেকথা শুনে ছেলেটি সারারাত ঘুমোতে পারেনি।

এই অমানুষিক পরিশ্রম বৃথা যায়নি তাঁর। শৈশবে বাবার জন্য নৌকো বানাতেন যে ছেলেটি, একদিন তিনিই ভারতের নিজস্ব ক্ষেপনাস্ত্র উদ্ভাবন করে দেশবাসীর নিরাপত্তাবিধানে বিশেষ অবদান রাখলেন। একদিন তিনি সর্বসম্মতিক্রমে হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। মেয়াদ শেষে ফিরে গেলেন তাঁর নিজস্ব ভুবনে– প্রিয় পেশা শিক্ষকতায়। তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে স্বপ্ন ছড়ানোর ব্রত নিলেন– ভারতে, ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন। গভীর নিষ্ঠা আর বিশ্বাস তিনি বললেন, আমরা রাতে ঘুমিয়ে যা দেখি তা আসলে স্বপ্ন নয়, বরং স্বপ্ন সেটাই যা আমাদের ঘুমাতে দেয় না...

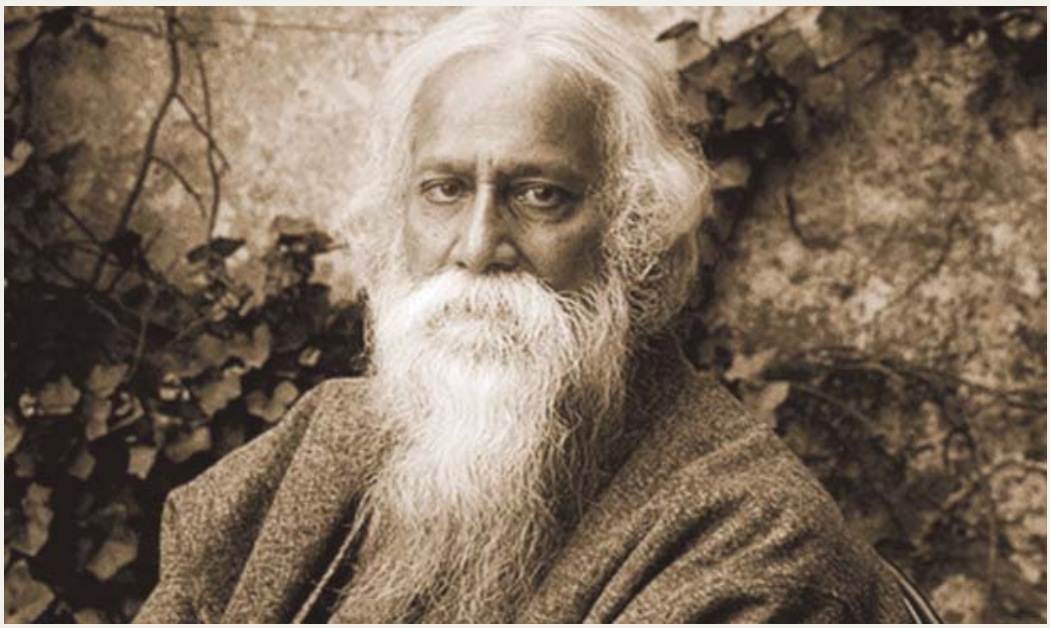

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রভাবনায় ইউরোপ বনাম এশিয়া

ক য়ে ক টি সূ ত্র

আহমদ রফিক

খণ্ড খণ্ড জমির আল তুলে দিয়ে একত্র আবাদের প্রবৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথের সমাজবাদী ভাবনায় শুভ সম্ভাবনার আভাস জাগিয়ে তুলেছিল কিন্তু কৃষকের সনাতনী ভাবনার কারণে কৃষির এদিকটাতে রবীন্দ্রভাবনা সাফল্যের মুখ দেখেনি। রাশিয়া সফরে গিয়ে (১৯৩০) যৌথ খামার প্রকল্পের সাফল্য দেখে অভিভূত রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিজ্ঞতা তাঁর মনোবেদনার কারণ হয়ে ওঠে। প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের এ ধরনের চারিত্রিক প্রভেদ রাষ্ট্র ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও বোধহয় প্রযোজ্য। তবে এটাও ঠিক, প্রতীচ্যের ঐ চরিত্রের প্রকাশ সমাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার কারণে।

সেই কবে রবীন্দ্রনাথ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে প্রয়োজনীয় কাজটি এতকাল পরেও সম্পন্ন হয়নি, হওয়ার কোন লক্ষণও নেই। অথচ মূলত অর্থনৈতিক প্রয়োজন সামনে রেখে (ভেতরে শ্বেতাঙ্গ ঐক্যের ভাবনা সক্রিয় ছিল কিনা কে জানে) ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঠিকই গঠিত হল অভিন্ন মুদ্রাসহ যা তাদের রাজনৈতিক শক্তিরও প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রের সীমানারেখা তথা আল তুলে না দিয়েও ঐক্যের সমাপন, অভিন্ন মুদ্রা যদিও ঐ আল তুলে দেওয়ার মতই।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন মানবতন্ত্রের বিপরীতে রাজতন্ত্র, ধনবাদী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী প্রতীচ্যের আগ্রাসী চরিত্র সম্বন্ধে একাধিক রচনায় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, লিখেছিলেন ধনতন্ত্রের ভয়াবহ শোষণের চরিত্র সম্বন্ধে বেশকিছু কথা। আর এজন্য 'ডিকটেটরশিপ মহা আপদ' বিবেচনা করেও শোষণমুক্তির জন্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন।

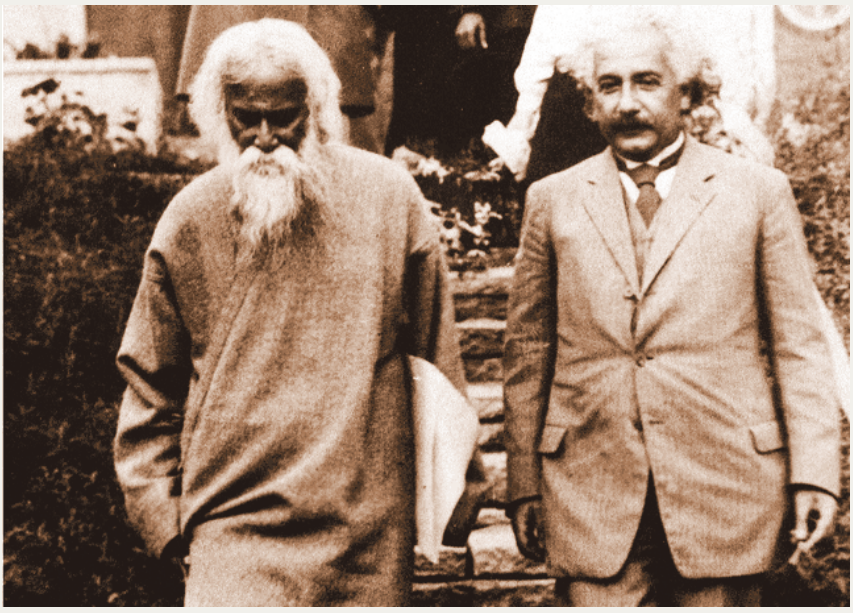

১৯৩০ সালে বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ যে বুদ্ধিজীবির চৈতন্যকেও কিনে নিতে সক্ষম তার প্রমাণ শুধু হান্টিংটনের *সভ্যতার সংঘাত*এই নয়, আপাত নিরীহ সংস্কৃতিবাদের রচনায়ও প্রকাশ পায়। বছর কয় আগে বিলেতে প্রকাশিত অ্যান্ড্রু রবিনসন ও কৃষ্ণা দত্তের লেখা রবীন্দ্রবিষয়ক ঢাউস বই *টেগোর দ্যা মিরিয়াড মাইন্ডেড ম্যান*এ অভি যোগ আনা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে অহেতুক নিন্দা এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের যুক্তিহীন প্রশংসা করেছেন। অনেক কথার সারকথা এটুকু। বুঝতে কষ্ট হয় না ব্যক্তিস্বাধীনতার দৌড় কতটা এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সংস্কৃতির শিকড়ে কতদূর পৌঁছতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নেই, সোভিয়েত রাশিয়াও নেই, সে এখন ইউরোপীয় রাশিয়া– তবু রুশবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী প্রচার ও প্রভাব সংস্কৃতিকে দূষিত করে চলেছে। আর চিনের সঙ্গে চলছে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির নীরব আর্থরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক প্রচারপ্রতিযোগিতা। এক্ষেত্রে অবশ্য চমস্কিরা ব্যতিক্রম।

দুর্বল এশীয় দেশ ও পশ্চাদপদ আফ্রিকার দেশগুলোতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, শাসন্ন শোষণ রবীন্দ্রনাথের মনে তিক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে তাঁর লেখায়। তাঁর বিশ্বভ্রমণ, বিশেষ করে আমেরিকা সফর পাশ্চাত্য পরাশক্তি সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয় যা প্রকাশ করতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল না।

পাশ্চাত্য রেনেসাঁর আলোকদীপ্তির মুগ্ধ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের পরদেশ দখল ও সেখানে বিদেশী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া জবরদস্তির সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও তিনি সংস্কৃতির সুস্থ আদানপ্রদানে বিশ্বাসী। তবে সেটা যেন একপক্ষীয় না হয়। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সম্বন্ধ নিয়ে তুলনামূলক বিচারে প্রাচ্যনৈতিকতার বিপরীতে পাশ্চাত্যের আগ্রাসী চেতনা রবীন্দ্রনাথের কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে বিশেষত তাঁর বহুকথিত মানবধর্ম ও মানবসম্বন্ধের প্রেক্ষাপটে। আর প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্যদেশীয় পারস্পরিক অনৈক্যের সমালোচনাও করেছেন তিনি।

তাই অবাক হবার কিছু নেই যে ১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর পার্শি যুবক সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন এবং তা সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় (২ ডিসেম্বর, ১৯৩৩) ছাপা হয়। স্বল্পপরিচিত এ রচনাটি বর্তমান বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে খুবই প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায়ই বলেছেন: 'বর্তমান যুগ ইউরোপীয় শক্তিমত্তার যুগ'। তাই এশিয়াকে 'পাশ্চাত্যের সংঘবদ্ধ ক্ষমতা ও অদম্য আত্মশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বেয়নেটের মুখে আমাদিগকে তাহারা বিশ্বাস করাইয়াছে যে, তাহারাই ভগবানের একমাত্র নির্বাচিত শ্রেষ্ঠজাতি।... আমার মনে হয় সবচেয়ে সর্বনাশের মূল হইতেছে উৎকোচের দ্বারা প্রাচ্যের সকল জাতিকে তাহাদের ভবিষ্যৎ বিকাইয়া দিতে বাধ্য করা'।

রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্যের যথার্থতা ইতিহাসই সত্য প্রতিপন্ন করেছে। 'এশিয়ার সহিত ইউরোপের সম্পর্ক' শীর্ষক ঐ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ নবীন ইউরোপের পেশী শক্তিবলে প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলোকে জয় করার কথা বলেছেন যা তাঁর মতে নীতিধর্মবি রোধী। প্রসঙ্গত তিনি আধুনিকতা সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রকৃত আধুনিকতার সত্য এর মানবিক চেতনা তথা মানবধর্মের সারল্যে নিহিত। আধুনিক সমাজ একটি বিশিষ্ট সত্যকেই যুগে যুগে ধারণ করে থাকে এবং তা হল মানবিক সত্য।

কিন্তু পাশ্চাত্য আধুনিকতা তার ইতিবাচক দিক সত্ত্বেও উল্লিখিত সত্য মেনে নেয়নি। শক্তির ভাষাই তার জন্য সত্য। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ইউরোপ তার আত্মপূজার বলিস্বরূপ এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের আত্মসমর্থনের দাবি করে'। কথাগুলো একালের নয়া মার্কিনি বিশ্ববিধান (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার) প্রসঙ্গে খুব খাটে এবং বহুকথিত 'বুশ ডকট্রিন'এর বিশ্ব আগ্রাসী নীতির সঙ্গেও খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্মরণ করা যায় রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য; 'আমাদের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইউরোপ আমাদের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে বিরত হয় নাই'।

এর অর্থ শক্তিমানের জবরদস্তি প্রাচ্যের তথা দুর্বল বিশ্বের দেশগুলোকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পদানত করে রেখেছে; নিয়ত শোষণ করে চলেছে। শোষণ যেমন অর্থনৈতিক তেমনি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক। এ পরোক্ষ প্রভাবের বর্তমান উৎস দুই মহাযুদ্ধ শেষে শক্তিধর রূপে উঠে আসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে আগ্রাসন চালিয়ে তার বৃহৎ তেলসম্পদ দখল করতে ইঙ্গমার্কিন পরাশক্তির বাধেনি।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত ব্রিটেন ইরাক থেকে তার সেনাবাহিনি সরিয়ে আনবে। কিন্তু পুরোপুরি আনবে না যুক্তরাষ্ট্র, তার কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্টের প্রতিরূপ। রবীন্দ্রনাথের কালে এ নবীন পরাশক্তির উদ্ভব ঘটেনি। তখন উপনিবেশবাদী ইউরোপই ছিল পরাশক্তি। তাই রবীন্দ্রনাথ বারবার ইউরোপীয় আগ্রাসনের কথাই উল্লেখ করেছেন যা একালের মার্কিন পরাশক্তির

১৯২১ সালের জুনে লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ

আগ্রসনের সমতুল্য।

এখনকার মত তখনো ইউরোপীয় আধিপত্যবাদী শক্তি তাদের অর্থশক্তি, অস্ত্রশক্তি এবং উন্নত বিজ্ঞানপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করেই বিশ্ব শাসন করেছে। সেই সঙ্গে ছিল উচ্চমন্যতার আভিজাত্যবোধ যা বিজিত দেশের আত্মমর্যাদাবোধকে বরাবর আঘাত করেছে। স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সেই বহুকথিত উক্তি প্রাচ্যপা শাত্যের পারস্পরিক ভিন্নতা নিয়ে: 'পাশ্চাত্যের এই ভেদাভেদতন্ত্রের মূলে রহিয়াছে অন্যজাতির প্রতি ইহাদের অপরিসীম ঘৃণা। জন্মগত স্বাধিকারের নামে অসীম গর্বভরে অন্যজাতিকে ঘৃণা করা পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য'।

প্রাচ্যদেশীয় স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধে বিরাজমান পারস্পরিক অনৈক্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির স্বল্পতাই যে আমাদের মহাদেশীয় শক্তির দুর্বল বিন্দু, বলা যেতে পারে 'একিলিসের গোড়ালি' সে বিষয়ে আমাদের সচেতনতা যেমন রবীন্দ্রনাথের আমলে প্রয়োজন ছিল, এখন সে প্রয়োজন অনেক অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আধিপত্যবাদী পরাশক্তির পরাক্রম আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি এবং তা অতিউন্নত প্রযুক্তির কারণে।

সেজন্য সবচেয়ে জরুরি ঐক্যচেতনা। ইউরোপের ঐক্যবন্ধনের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ইউরোমার্কিন ঐক্যশক্তি যা বিশ্বজয়ের উন্মাদনায় মাতাল– সে প্রভুত্বের ভুবন এশিয়া ও আফ্রিকা। কর্পোরেট পুঁজির সঙ্গে আগ্রাসী বিদেশনীতির মেলবন্ধন মুনাফার নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। য়ে কোন মূল্যে সে দরজা বন্ধ করতে হবে। এশিয়াআফ্রিকা, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকারও বাঁচার ঐ একটিই পথ। দক্ষিণ আমেরিকা ধীরে হলেও ওই পথ ধরে চলতে শুরু করেছে আংশিক ঐক্যের মাধ্যমে।

শক্তির সঙ্গে শক্তির মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ঐক্য। কিন্তু সেখানেই যত সমস্যা। চোখের সামনে ওদের সর্বনাশা উদাহরণ দেখেও 'ন্যাম' বা 'ওআইসি'র মত প্লাটফর্ম যখন পশ্চিমা বিরোধিতায় একমত হতে পারছে না, জোট তখন অর্থহীন। ছোট আয়তনেই যেখানে গরমিল সেক্ষেত্রে মহাদেশীয় ঐক্য কীভাবে সম্ভব? কীভাবে সম্ভব আন্তঃমহাদেশীয় তথা আফ্রোএশীয় ঐক্য? একক স্বার্থের টান আর শত্রুপক্ষীয় কূটনীতির বেড়াজাল বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ বুঝতে চাইছে না যে অনৈক্যের ছিদ্রপথে সর্বনাশ তথা 'শনি'র ঘরে প্রবেশ নিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথ এ কথাগুলো নানাভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সুবিধাবাদ জাতীয় জীবনে 'রৌপ্যের মত্ততার বিষপ্রভাব' জাতীয় চরিত্রের সদগুণ নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রাচ্যের এই চরিত্রগত দুর্বলতার সুযোগ ইউরোপীয় চাতুর্য একদা গভীরভাবে নিয়েছে তাদের ভূখণ্ড বিজয় নিশ্চিত করতে, এখন সেই পুরনো মদই নতুন বোতলে রকমফেরে ভিন্ন এই যা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রবল কর্তৃক দুর্বলের শোষণই পরিণামে জয়লাভ করিয়াছে', এখনো করছে, ইরাক আফগানিস্তান তার প্রমাণ। অনৈক্যের ছিদ্রপথে বিশ্বরাজনীতি সক্রিয় বলেই 'লক্ষ্মীর বরপুত্র জাতিগণ (অর্থাৎ ধনবাদী শক্তিমান রাষ্ট্রসমূহ) তীক্ষ্ণ অস্ত্রকে সূতীক্ষ্ণ এবং শোষণকে আরো তীব্র' করে তুলতে পারছে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে তাই পরাশক্তির দাপট, তাদের ইচ্ছাই সবকিছুর শেষ কথা। রবীন্দ্রনাথের একদা কথিত 'দানবের শাসন' এখন সত্য হয়ে উঠেছে। 'দানবের শাসন' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন কার্জন হলে ১৯২৬ সালে তাঁর ঢাকা সফরের সময়।

এ দানবীয় দাপটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। তৃতীয় বিশ্বকে, দুর্বল বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ, জোটবদ্ধ হতে হবে। একসময় আফ্রোএশীয় সংহতির একটা ঝোঁক তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সে ঐক্যকে যথাযথভাবে লালন করা হয়নি। সে জোট যেমন ছিল অর্থনৈতিকরাজ নৈতিক তেমনি ছিল সাংস্কৃতিক। এখন নতুন করে তার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। প্রতিরোধের শক্ত প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন্ন শোষণের লোভ কখনো শেষ হবার নয়। এর বিরুদ্ধে তাই দরকার সংঘবদ্ধ লড়াই। রবীন্দ্রনাথ তাই সঠিকভাবেই আহ্বান জানান, 'পৃথিবীতে সংগ্রাম চলিবেই। এই সংগ্রাম এড়াইয়া চলিতে গেলেই আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সংগ্রামের পর সংগ্রামের ভিতর দিয়া আমাদের আদর্শ বিকাশের পথে চলিয়াছে। সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য নৈতিক বিচারই যুদ্ধকালে আমাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই অস্ত্রের দ্বারাই আমরা প্রতিরোধ করিব, প্রয়োজন হইলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য আক্রমণ চলিবে'। শেষ বাক্যাংশটি তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ন্যায়ের রক্ষায় শুধু জাতিগত বা মহাদেশীয় ঐক্যেরই প্রবক্তা নন, তিনি একইসঙ্গে বিশ্ববাদী তথা মানবতাবাদী। অন্যায়শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক ঐক্য অপরিহার্য বিবেচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ববাসীর নৈতিক সমর্থন ন্যায়ের হাত শক্তিশালী করবে সন্দেহ নেই। তা না হলে অন্যায়ের জয় অনিবার্য। লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, শান্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ন্যায়ের জন্য আক্রমণেও প্রস্তুত। অন্যায়কারীর শাস্তির দায় বিধাতার ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন না। বরং দানবের সঙ্গে সংগ্রামের

স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় রবীন্দ্রনাথ

জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন সেই ১৯৩৩ সালে– তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শেষ দশকের গোড়ার দিকে।

ইতোপূর্বে ইঙ্গমার্কিন পরাশক্তির ইরাক আক্রমণ ও দখলের কথা বলা হয়েছে। পরাশক্তির বিরুদ্ধে শক্তিহীন জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে চলেছে ঐ আক্রমণ সর্বাধুনিক অস্ত্র নিয়ে। প্রমাণিত হয়েছে উপলক্ষ্যটি মিথ্যা। প্রাচীন মেসোপোটেমীয় সভ্যতার আধুনিক প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ জ্বলছে, সে আগুন এখনো নেভেনি। শিশুনারীসহ ল ক্ষ লক্ষ ইরাকি নিহত। রবীন্দ্রনাথ্লকথিত পা শ্চাত্যের উন্মত্ত লোভ মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলসম্পদ দখলের জন্য এ অঘটন ঘটিয়েছে। লুণ্ঠনে আধুনিক ইউরোমার্কিন পরাশক্তি তাতার মোঙ্গলদেরও ছাড়িয়ে গেছে।

এ অন্যায়যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বের শান্তিবাদী মানুষ প্রতিবাদ জানালেও ক্ষান্ত হয়নি পরাশক্তি। এর কারণ মধ্যপ্রাচ্যের এবং এশীয় দেশগুলোর সংঘশক্তির অভাব। স্বার্থবুদ্ধি, 'উৎকোচের লোভ' এবং দানবশক্তিকে ভয় মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোকে ইরাকের পাশে দাঁড়াতে দেয়নি। শক্তিমান চিন্নভারত নীরব। ন্যায়ের পক্ষে এ অনৈক্যই দানবশক্তিকে জয় পেতে সাহায্য করেছে, তাদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে।

তাদের সাহসী আগ্রসনের নতুন নমুনা লিবিয়া। লিবিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলিয়েছে ইঙ্গমার্কিন্লফরাসি রণশক্তি। উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ লিবিয়ার তেলসম্পদ যা আফ্রিকার মধ্যে সর্ববৃহৎ। এরপর রয়েছে সিরিয়া– যেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। সঙ্গে জঙ্গি ইসলাম শক্তি। তাতে যুক্ত পরাশক্তি স্বার্থ। এতসব দেখেও এশিয়্লাআফ্রিকার দেশগুলোর চোখ খুলছে না। লিবিয়ায় আক্রমণের বিরুদ্ধেও শক্তিমান চিন কার্যকরভাবে এগিয়ে আসেনি। ইউরোপীয় রাশিয়া নীরব। তবে সিরিয়ার ব্যাপারে নড়েচড়ে বসেছে। নানা স্বার্থের টানাপড়েনে পুড়ছে সিরিয়া। তার একাংশ আইএস জঙ্গিবাদের দখলে।

দুই.

রবীন্দ্রনাথ তিরিশের দশকের শুরুতে ইউরোপের দানবীয় শক্তিগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ করে এবং চল্লিশের দশকের সূচনালগ্নে অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধকালে সভ্যতার সমূহ সংকট উপলব্ধি করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাত দশক পরও মানবিক সভ্যতার সংকট কাটেনি। বরং তা আরো নগ্ন হামলার সম্মুখীন। এ জাতীয় আক্রমণে দানবশক্তির জয় পৃথিবীতে দানবীয় বৈশ্যশাসন কায়েম করবে, বিশ্বে ন্যায় নীতি ও নৈতিক সত্যের পরাজয় ঘটবে, মানবধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এমন আশংকার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতীয় স্বার্থের সংকীর্ণ চেতনা ও সুবিধাবাদ এশিয়্লাআফ্রিকার দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে দিচ্ছে না। এ ধরনের আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের পরিণাম যে এশীয়্লআফ্রিকার দেশগুলোর জন্য মোটেই শুভ নয় সে সত্য জেনে বুঝেও তারা নীরব, নিষ্ক্রিয়। মাঝে মধ্যে ঐক্যের কথা বা নতুন জাতিসংঘ গড়ার কথা বলা হলেও তা অর্জন খুবই কঠিন, মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ যাই বলুন না কেন।

তিরিশের দশকে ঐ বিশেষ বক্তৃতায় এবং তারপরও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এশিয়া বনাম দানবশক্তি সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তা আজও আমাদের জন্য সত্য হয়ে আছে। শুধু এশিয়্লাআফ্রিকা নয়, মানবিক সভ্যতা ও মানবীয়নীতির ঐতিহ্য রক্ষায় যেমন বিবেকবান মানুষ তেমনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যুক্তিবাদী ও শান্তিবাদী মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে। তাদের সমর্থন শক্তির পক্ষে নয়, ন্যায় ও শান্তির পক্ষে।

মানুষ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। এ সত্য যেমন রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, এমনকি রাসেল বা শ'র মত বিবেকবান মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, এখনো তাই। তাই তাঁদের নীতিগত পথ ধরে নতুনভাবে হলেও দরকার বিশ্বজনীন ঐক্য, সাধারণ মানুষের ইচ্ছার পক্ষে এশিয়্লাআফ্রিকার দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ বা জোট তৈরি করা। মানুষ যে যুদ্ধ চায় না, আগ্রাসন চায় না তা খাস ইঙ্গমার্কিন মুল্লুকেও সাধারণ মানুষের যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক ছিলেন না, ছিলেন রাজনীত্লিস চেতন। যেমন স্বদেশী তেমনি বিশ্বরাজনীতি নিয়েও ভাবিত ছিলেন। তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে 'মানুষ' শব্দটি তার বহুমাত্রিক অনুষঙ্গ নিয়ে বরাবর সক্রিয় ছিল। তাই মানবসম্বন্ধ, মানবকল্যাণ, মানবধর্ম ও মানবীয় সত্য তাঁর জীবনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল। চেতনার সেই আলোকে তিনি যেমন বিশ্বশান্তি প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি অত্যাচারিত শোষিত্লশাসিত এশীয় ভূখণ্ডের অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলেছেন আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর হামলা ও শোষণের কথা। আফ্রোএশিয়ার রাজনীতি কি ভূখ -গত স্বার্থরক্ষার আয়োজনে ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে না? হামলার শিকার মধ্যপ্রাচ্য কি তার সমূহ বিপদ বিবেচনায় আনবে না? হবে না সংঘবদ্ধ? না হলে অনিবার্য বিপদ ঠেকাবার কোন উপায় নেই।

আহমদ রফিক প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ

আর্জেন্টিনায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও অন্যান্য সুধীজনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ

ভ্রমণদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ

জামিরুল ইসলাম শরীফ

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যাযাবরের চিহ্ন যেমন আছে, তেমনি এ এক মোহ। তার পরিচয় পাই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজকের উন্মুখী জীবনযাত্রার পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাতে। প্রয়োজনের তাগিদে, বসতিগড়ার সন্ধানে মানুষ জায়গা বদলে চলে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। বাসস্থান পরিবর্তন, পরিত্যাগ ছাড়াও প্রাথমিক কারণ ভৌগোলিক অর্থাৎ বিরুদ্ধ পরিস্থিতিপ্রকৃতি, আহারসংস্থান বহুবিধ কারণে। আর আছে মোহ– বাসনার দূরত্বমুগ্ধ ভ্রমণপিয়াসী যাত্রী, চোখে তার কোন ক্ষুদ্র দ্বীপের আভাস, বন্ধ্যা পাথরের দ্বীপ, নয়তো রমণীয় বনপথ, নগরের সমৃদ্ধ প্রাসাদ, সমুদ্রপ্রাণের উল্লাসভরা সাগরের নীল শয্যা আর সুন্দরতর দূর আকাশের দেয়ালে ফোটে অদ্ভুত ফুলসজ্জায় যুগ্মপ্রাণের ভাস্বর উদ্ভাস। এমন ইন্ধনে আজকে সভ্যতার চরম অবস্থায় এসে স্থিতিশীল হয়েও সে সুস্থির নয়, তার মোহ কাটল না। তার প্রকৃতি খুব একটা বদলায়নি। অর্থাৎ মানুষ বুঝি চির ভ্রাম্যমাণ; 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে'– দূরত্বমুগ্ধ, সৌন্দর্যপিয়াসী মজ্জায় তার অবিরাম ঘোষণা।

সাহিত্যের ইতিহাসে তার যাযাবরী বর্ণনা ও ভ্রমণকাহিনির সার্থক উন্মোচন মানবপ্রকৃতিরই এক স্বতন্ত্র দিক। আটপৌরে জীবনে– ঘরের চার দেয়ালের ঘেরাটোপ যারা পেরোতে পারে না, দুর্লঙ্ঘ্য যখন প্রাত্যহিক জীবন, তাদের কাছে দুর্গম পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতালব্ধ কোন পাঠ, অজানা সমুদ্রপাড়ি কিংবা পর্বতশ্রেণির দুঃসাহসিক অতিক্রমণের কোন রোমাঞ্চকর কাহিনির বৃত্তান্ত তাদের কাছে মূল্যবানবিশেষ। আবার পৃথিবীর স্মরণীয় বৃত্তান্তগুলো মানুষের কাছে সম্পদতুল্য। একটা বিশেষ যুগের, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির, বিশেষ সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এই ভ্রমণপ্রোজ্জ্বল কাহিনির পাতায় পাতায়।

জাপানে বন্ধুত্ব ও সপারিষদ রবীন্দ্রনাথ

শ্রুতকীর্তি গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মিসর ভ্রমণের কাহিনি ইতিহাসবিখ্যাত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাড়া জাগানো ভ্রমণকারী মার্কো পোলোর কাহিনি বিশ্বনন্দিত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনে বতুতা পৃথিবীর সেরা ভ্রমণকারী। প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য বা দ্রাবিড় যে জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় আমরা পাই তারাও যাযাবর হয়ে এদেশে বসতি গড়েছিল। সুদূর বিদেশ থেকে এই ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতে এসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনিও কেউ কেউ রেখে গেছেন। তাদের মধ্যে ফাহি য়েন, হিউয়েন সাঙ, মেগাস্থিনিস প্রমুখের নাম আজও এদেশের মানুষ বিস্মৃত হয়নি।

দেশবিদেশের সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনি এ কারণে যথেষ্ট আকর্ষণযোগ্য উপাদান। বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে গত বেশ কয়েক বছরে। আমাদের কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও ভ্রমণপিপাসু মানুষদের কাহিনি এবং কারো কারো পর্যটনী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত হচ্ছে শোভন মলাটে এবং সচিত্র বর্ণনায় গ্রন্থবদ্ধ, নয়তো ভ্রমণভিত্তিক পত্রিকাসংকলনে। যদিও বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনির শুরু খুব বেশি দিনের নয়। দেশবিদেশ যারা ভ্রমণ করতেন, তাঁরা অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত লিখে রাখার খুব একটা প্রয়াস দেখাননি; কোন কোন ক্ষেত্রে সে বর্ণনা নিতান্ত প্রত্যক্ষতার বিবরণমাত্র, সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তেমন চিহ্ন রাখেনি।

বিগত উনিশ শতকের যে ভ্রমণবৃত্তান্তের, অভিজ্ঞতার নজির আমরা দেখি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী*র অংশবিশেষ, সঞ্জীবচন্দ্রের *পালামৌ* ভ্রমণের বিবরণ, বিবেকানন্দের *পরিব্রাজক* গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার প্রথম যুগের বিবরণ ইত্যাদি। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভ্রমণ সাহিত্যমাত্রেই বৈচিত্র্য ছাড়া তার আয়ুষ্কাল ক্ষীণ, বৈচিত্র্য অপেক্ষা কেবল বর্ণনাবিবরণ সে সাহিত্যের পক্ষে অকল্যাণকর। বিষয় বৈচিত্র্যের উৎকৃষ্টতা যেমন ভ্রমণসাহিত্যের কাল উপযোগী, তেমনি প্রত্যেকটি ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও অভিজ্ঞতার বিশিষ্টতা এমনই একটা বাড়তি গুণ যেটা কালাতিরিক্ত।

বিদেশ যাত্রার জোয়ারে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল, বিশেষ করে ভ্রমণসাহিত্যের বহর প্রবলভাবে প্রসারিত। অনেক ভ্রাম্যমাণই নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনি লিখেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনার উল্লেখযোগ্য (এর বাইরে অনুল্লিখিত লেখকগ্রন্থ সম্পর্কে অনীহা বোঝাবে না) হল অন্নদাশঙ্কর রায়ের *পথে ও প্রবাসে*, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের *ঘরের ছেলে বাহিরে*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *লন্ডনে দুর্গোৎসব, বিমানযোগে প্যারিস* অথবা *আরব মহানগরী*, রামানাথ বিশ্বাসের কয়েকটি অনবদ্য ভ্রমণকাহিনি, সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশে বিদেশে, মুসাফির*, দিলীপকুমার রায়ের *দেশে দেশে চলি উড়ে*, মনোজ বসুর *চীন দেখে এলাম*, বুদ্ধদেব বসুর *বীটবংশ ও গ্রিনিচ গ্রাম*, মৈত্রেয়ী দেবীর *অচেনা চীন* লেখাগুলো জানা চেনার ভাণ্ডারে পূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যে ঘরের কাছে ভ্রমণের মনোরম ভাবাবেশে দিগ্বিদিক বেড়িয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের উপহার দিয়েছেন *অভিযাত্রিক, তৃণাঙ্কুর, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও* প্রভৃতি গ্রন্থ। এ তালিকায় যুক্ত হতে পারে সৈয়দ মুজতবা আলীর *জলে ডাঙায়*, সতীনাথ ভাদুড়ীর *সত্যি ভ্রমণ কাহিনী* বুদ্ধদেব বসুর *কোণারকের পথে, গোপালপুর অন-সী*, অবধূতএর *মরুতীর্থ হিংলাজ*, জলধর সেনের *হিমালয়, প্রবাসচিত্র। তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ*খ্যাত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় আধ্যাত্মিক কারণে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ভ্রমণের এক বিচিত্র সম্মোহন। *মরকত রাজ্য* নামে একটি আশ্চর্য অধ্যায়ের বর্ণনার চিত্র আছে এতে। কীর্তিমান কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল ভ্রমণসাহিত্যেও খ্যাতিমান। শত বছর পেরিয়ে সম্ভবত বাংলা ১৩২৩এ প্রকাশিত গ্রন্থ পথের নকশায় তার *দেবতাত্মা হিমালয়*এর কাহিনি পাঠকদের কাছে প্রায় অবিনশ্বর, অভঙ্গুর অনুভূতি জাগায়। শুধু অতিপ্রাকৃতের মগ্নতা নয়, প্রাকৃত সৌন্দর্যের ধ্যানেও তিনি মগ্ন, তার পরিচয় আছে *হিমালয়ের পথে পথে* গ্রন্থে Valley of Flowersএর বর্ণনায়, সেখানকার বিচিত্র রঙিন ফুলের বিচিত্রতর নামগুলো নে, হেমকু-ও লোকপালের মন্দির প্রসঙ্গে প্রকৃতি বর্ণনায়। সবটা ছাপিয়ে প্রবোধ সান্যালের খ্যাতি *মহাপ্রস্থানের পথে* নামের ভ্রমণকাহিনি মধুরকরুণ গতির এক অসাধারণ আলেখ্যগ্রন্থ।

ভ্রমণ ও কাহিনী নামে প্রবোধকুমার সান্যালের এই গ্রন্থের মূল্যবান সংযোজন পৃথিবীবিখ্যাত মুসলিম ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা এবং তাঁর পর্যটন সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা। দুঃষ্প্রাপ্য হলেও চতুর্দশ শতকের এই খ্যাতনামা ভ্রাম্যমাণ সম্পর্কে প্রবোধের এই গ্রন্থটি যে কোন ভ্রমণপ্রেমিক বাঙালির পড়া উচিত।

অন্যদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়– যাঁর *দুয়ার হতে অদূরে* গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের সেই বহুশ্রুত কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়, বহু ব্যয় করে আমরা দেখতে যাই নানা দেশ ঘুরে পর্বতমালা সিন্ধু, কিন্তু 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপরে, একটি শিশির বিন্দু।'

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের খ্যাতি *পালামৌ* ভ্রমণবৃত্তান্তে। সঞ্জীবচন্দ্র ও *পালামৌ* যেন একই অচ্ছেদ্য বন্ধনে পূর্ণ। *পালামৌ* সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সঞ্জীব বালকের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলো নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।'

সঞ্জীবচন্দ্রের *পালামৌ* ভ্রমণকাহিনিটি *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার (১৮৮০-৮২) বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশের পর গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯৩ সালে। বিহারের পাহাড়ঘেরা ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল পালামৌ পরগনায় সঞ্জীবচন্দ্র সরকারি কাজে গিয়েছিলেন। বেশিদিন সেখানে থাকতে না পারলেও সঞ্জীবঅনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়– 'কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহার চিহ্ন বাংলা সাহিত্যে রহিয়া গেল।' সরস মাধুর্য, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি *পালামৌ*ভ্রমণ অকৃত্রিমতায় জড়ানো। বনভূমিপাহাড়বৃক্ষসারি স্থানীয় কোল অধিবাসীর স্বচ্ছন্দ জীবনাচার প্রভৃতির বর্ণনায় 'মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ' ছড়ানো। পাহাড়ের পাদদেশ হোক, ঘনজঙ্গল হোক, সেদিন সঞ্জীবচন্দ্রের মন ছিল উদাসীন শিল্পীর– 'নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য থাকিলেও আমি তাই ফেলিয়া যাইতাম, চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম, 'কেন তাহা কখন' ভাবিতাম না..." কিন্তু পরবর্তীকালের স্মৃতিচারণে সঞ্জীবচন্দ্রের স্থান কাল

রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ

প্রেক্ষিতের অতীত: ‘এখন দেখি এ বেগ একা আমার নয়। যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পাইল না সে অভাগিনী। সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধহয়, আমিও পৃথিবীর রংফেরা দেখিতে যাইতাম।’

সময়ের প্রভাবে মানুষের অন্তঃপ্রদেশে অভিজ্ঞতার যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে, সে প্রসঙ্গে একটি এক্কশিলা পাথ রের পাহাড়ের ওপর একটি অশ্বত্থ গাছের প্রাণপ্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিহাসরসিক সঞ্জীবচন্দ্রের মন্তব্যটি আশ্চর্যরকমেই স্মরণীয়– ‘তখন মনে হইয়াছিল অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নিরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থ গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।’ *পালামৌ* ভ্রমণবৃত্তান্তে সঞ্জীবচন্দ্রের এমন কয়েকটি উক্তি প্রবাদের অব্যর্থ দৃষ্টান্ত হয়েই আছে; তার মধ্যে ‘বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে’ কালক্রম সত্ত্বেও এই উক্তির বাক্যস্ফূর্তিই কেবল বাঙালি কেন বিশ্বব্যাপী সকল মানসলোকে এর যথার্থতা– আবেদন অমলিন (থেকে গেল)।

ভ্রমণসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ অনন্য। এই জগৎকে তিনি কেবল কাব্যশৃঙ্খলায় বাঁধেননি, দিব্যদৃষ্টির অঞ্জন পরেই তিনি জীবনকেও দেখেছিলেন বিপুল– সুদূরের পিয়াসী হয়ে। ‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি’– এই আক্ষেপ সত্ত্বেও বিরাট পৃথিবীর অভিব্যাপ্ত অন্বেষণে নামেন, তা কেবল নিসর্গজাত নয়, দ্রষ্টার মানসে দেশ্লবি দেশে নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির তীক্ষ্ণ আলোচনায়, ভ্রমণ উপলক্ষ্যে নানা সরস ধারাল্লোগভীর ও নন্দিত রচনায় ভ্রমণ্লসাহিত ্যকে শিল্পমাত্রার উৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। এরপর জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁকে অসংখ্যবার যেতে হয়েছে ভারতবর্ষের বাইরে। শেষবার বিদেশ যাত্রার সময় তাঁর বয়স সত্তর পেরোলেও বার্ধক্য স্থবির মৌন করে তোলেনি। তাছাড়া ভারতের মধ্যে নানা জায়গায় যাওয়াআসাও ছিল অবিশ্রান্ত। স্থানীয় প্রকৃতিকে তিনি আবাল্য ভালবেসেছেন এবং নিসর্গের মহত্ত্ব তাঁকে পারিপার্শ্বিক মানুষের অনেক ক্ষুদ্রতাও ভুলিয়ে দিয়েছে। *মানসী*তে আমরা যে প্রকৃতিকে দেখি, তার সঙ্গে বাংলার পল্লীশ্রীর সাদৃশ্য অনেকটা বাহ্যিক এবং বাংলার প্রাদেশিক রঙে বিশ্বপ্রকৃতির ভাবমূর্তির সাযুজ্যও এঁকেছেন তিনি ব্যাপক ভ্রমণের অভিজ্ঞতার স্মরণীয় রচনার আধারে– রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে তার পরিচয় অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত ভ্রমণকাহিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষে জগৎ্ল সুন্দরের অভ্যস্ত ধ্যানে কেবল আনন্দময় নয়, নানা বৈপরীত্য, কুৎসিতের দৌরাত্ম্যে উপদ্রুতের সাক্ষ্যও মেলে। খুব সংক্ষেপে তাঁর ভ্রমণকাহিনি বিশেষ তিনটি ভাগে আমরা দেখি: প্রথমভাগে– পাশ্চাত্যদেশীয় ভ্রমণ বিবরণ– যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *য়ূরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ূরোপযাত্রীর ডায়ারি* (কবির ত্রিশ বছর বয়সে লেখা), *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি*। দ্বিতীয়ভাগে– *জাপানযাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি* ও *পারস্যে* এবং তৃতীয়ভাগে– *পথের সঞ্চয়, পথে ও পথের প্রান্তে* এবং *জীবনস্মৃতির* অংশবিশেষ ইত্যাদি।

য়ূরোপ প্রবাসীর পত্র-এ উনিশ শতকের শেষধাপের পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার পরিচয় আছে, যেখানে কল্পনার ইংলন্ডের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক অমিল। জীবিকার জন্য এখানকার মানুষদের নৈমিত্তিক বোঝাবুঝি ও বাড়ন্ত ব্যস্ততা প্রায় অভিন্ন– ‘সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায়, এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা।’ ঊর্ধ্বশ্বাসী জীবনযাত্রায় আছে বিভিন্ন নাচের আসর, অসুন্দরী মেয়ের বিয়েতে নারী সমাজের অসঙ্কোচ কোলাহল, ল্যান্ডলেডিকে নিয়ে বিচিত্র ঘটনা, স্ত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গও আছে। আছে সমাজে স্বদেশীয় কুসংস্কার ত্যাগ করে বিদেশির কুসংস্কার আঁকড়ে থাকার করুণ প্রবণতার ইতিবৃত্ত।

*য়ূরোপ যাত্রীর ডায়ারি*তে পশ্চিমি সভ্যতার প্রবল পদধ্বনি, উন্মাদনা এবং উদ্যোগী পরিবেশের ব্যাপক পরিচয় আছে, আছে ভারতবর্ষের স্থির, অনাগ্রহী অর্থাৎ উদ্যমহীন গতানুগতিক অনৈক্য জীবনযাত্রার তুলনামূলক আলোচনার তীক্ষ্ণতা আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘...দুর্বলদের আশ্রয়স্থান এ সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কেবলই কার্য চাই, কেবলই শক্তি চাই, কেবল গতি চাই...।’ পশ্চিমি সভ্যতার এই প্রকৃতি ফ্রান্সে গিয়েও লক্ষ্য করেছেন, ‘এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে বোঝাপড়া হয়ে আসছে, একদিকে প্রকা- প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে, আর একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে– য়ূরোপের সে ভাব নয়।’ তাহলে তার কী ভাব? রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, ‘য়ূরোপীয় সমাজে একদিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা, তেমনি বাধাহীন স্বার্থপরতা।’ এ প্রসঙ্গে তাঁর সরস মন্তব্যও বেশ উপভোগ্য– ‘আমাদের যেমন প্রতিবছর পরিবার, ওদের তেমনি প্রতিবছর আরাম বাড়ছে।’ তার মানে ওরা সুখে বাড়ছে, সংখ্যায় নয়। মনে রাখতে হবে এসব মন্তব্যের কাল আজ থেকে সওয়াশো বছর আগের এবং রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে ওই মন্তব্যের উপসর্গ আমাদের কালে অনিবার্য পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাম্যমাণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোধহয়, পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের বংশভুক্ত হয়েও যখন নিজের বৈশিষ্ট্য হারাননি এবং যৌবনসুলভ

আসক্তি সত্ত্বেও আগামী জীবনযাত্রায় নিরাসক্তির সমন্বয় খোঁজেন, তখন ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্যের প্রশস্তি যেমন তাঁর রসগ্রাহী রচনায় অকৃপণভাবে বর্ণিত, তেমনি আর্ট একজিবিশনে বসনহীনা নারী সৌন্দর্যের সুঠাম ও সুনিপুণ ভঙ্গিমার বিশ্লেষণে তিনি সে যুগের বাঙালি হিসাবে দারুণ দুঃসাহসী এবং যৌবনসুলভ অধ্যাত্মনিষ্ঠায় নম্রতা ও সাম্য আর কোন বাঙালির মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ।

*পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি*র রচনাকাল ১৯২৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পৃথিবীময় ঘটে গেছে যেমন নানা ওলোট পালোট, তেমনি রবীন্দ্রমানসেও পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাপকভাবে পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায় তিনি লক্ষ্য করেছেন, বাবামা য়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলেমেয়ের নাড়ির টান যেমন ঘুচে গেছে, তেমনি স্ত্রীপুর ষের সম্পর্কে জটিলতাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। আবার সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির, যুদ্ধনীতির এমনকি বাণিজ্যনীতির ঘোড়দৌড় চলেছে জলে স্থলে আকাশে। অথচ এই ভীষণ প্রত্যক্ষতার মধ্যেও রবীন্দ্রমানস ভ্রমণের চিরকালীন সত্যকে ভোলেনি– 'আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ– দেবতাকে অভ্যাসের পর্দায় ঘিরে না রেখে, তীর্থযাত্রায় সেই পর্দা ঠেলে দিয়ে মন বেরিয়ে পড়ে।'

জাপানে, জাভাযাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি এবং *পারস্যে*এর প্রতিটি ভ্রমণবৃত্তান্তে দ্রষ্টার মানসপর্দা ঠেলে বেরিয়ে পড়ার চমকপ্রদ বিবরণ আছে। দ্রষ্টার সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন সেদিনের জাপানের উগ্র ইউরোপীয় বেশ ও চরিত্র। অথচ প্রাচীন জাপানের চিহ্ন যে নেই তা নয়। তারা স্বভাবত শান্ত, নিরুপদ্রব ও সংযমী। 'রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না; লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না।...শোকে, দুঃখে, আঘাতে, উত্তেজনায় ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে।'

জাপানিরা স্বল্পবাক, প্রকাশভঙ্গি সবসময় সংযত সংক্ষিপ্ত– 'সেই জন্যই এখানে এসে অবাধ, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনিনি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ।' ওদের বাকসংযম নিয়ে, সংযমী হাইকু কবিতা নিয়ে, পুষ্পপ্রীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। জাপানি সংগীত তাঁর ভালো লাগেনি, কিন্তু জাপানি নৃত্য মুগ্ধ করেছে। তাকে মনে হয়েছে দেহভঙ্গির সংগীত– 'সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। ...জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ।' তিনি দেখেছেন, জাপানিরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ তা নয়, মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মতো আয়ত্ত করেছে। ...সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি, তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্যবোধ।

ঠিক একই ভূপ্রদক্ষিণে চিনের সঙ্গে নৌযুদ্ধ জয়ের চিহ্নগুলো পুঁতে রাখার অমানবিক বর্বরতাও দেখেছেন। *জাভাযাত্রীয় পত্র* রচনায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ও সেদিনের পরিচয়ের সঙ্গে আমরা জানতে পারি দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকেও, যিনি লক্ষ্য করেছেন সেখানকার ভাব্লরীত্তিনীতির সঙ্গে হিন্দু মানসিকতার মিল, এদেশের মানুষের ওপর মহাভারতের কাহিনির প্রভাব, তাদের নৃত্যতা লের বৈশিষ্ট্যে এবং মন্দিরের কারুকার্যে।

এমনি করেই পৃথিবীর নানা প্রান্তের সারসংগ্রহে সময় ও স্থানের অমূল্যধন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু রবীন্দ্রনাথের মন বাইরে যাবার জন্য সদা চঞ্চল। প্রমথ চৌধুরীকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'কিছুদিন থেকে মনটা একদিকে ক্লান্ত, অন্যদিকে চঞ্চল– বোধহয় একবার পারাপার করে এলে আবার কিছুকাল স্থির হয়ে বসতে পারব।' (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড)। আবার কন্যা মীরা দেবীকে লিখছেন, 'আমি বারবার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষকালে স্পষ্ট বুঝেছি আমাকে বিধাতা গৃহস্থ ঘরের জন্য তৈরি করেননি। বিশ্ব আমাকে বরণ করে নিয়েছে, আমিও তাকে বরণ করে নেব।' (চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড)।

এ রকম এক পরিস্থিতিতে তাঁর জাপান ও আমেরিকা যাত্রা শুরু ১৯১৬ সালের ৩ মে। জাপানের পথে চারদিন বাদে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন বন্দরে (ইয়াংগন) জাহাজ থামলে দু'দিন ধরে শহর দেখলেন। পথে সিঙ্গাপুরেও নামলেন। বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের কবলে পড়ে সে অভিজ্ঞতাও হল। আবার হংকং যে জাহাজ দু'দিন রইল, কবি অবশ্য নামলেন না। বরং চিনা শ্রমিকদের কাজ দেখে মুগ্ধ সময় কাটালেন, '–তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সংগীতের মতো বেজে উঠছে। জাহাজের ঘাটে মাল তোল্লানামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না।... কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ৰমতা সমস্ত দেশজুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে।... যে সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো আনা ব্যবহার করবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোন অংশ ফাঁকি দেয় না, সে যে মস্ত সাধনা।... চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে; কাজের উদ্যমে সে চীনকে জিততে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।'

*রাশিয়ার চিঠি*র সময়কাল ১৯৩০। রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় সত্তর। এক নূতন সমাজব্যবস্থা, তার অভিনয় কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সচেতন মন সাড়া জাগিয়ে বলে উঠল: 'কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্য কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম! প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারত।' অবশ্য এই সঙ্গে এদের শিক্ষাব্যবস্থার ছাঁচে ঢালা ব্যবস্থার গলদও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাহলেও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন– 'আপাতত রাশিয়ায় এসেছি– না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।'

জমিদারির কাজে বাংলাদেশের চাষীদের চেহারাচরি ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে রাশিয়ার চাষী গোষ্ঠীর উল্কাপ্রতিম অগ্রগতি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক...।' রাশিয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যেসব দেশে তিনি ঘুরেছেন, তারা সমগ্রভাবে তাঁর মনকে নাড়া দেয়নি। কিন্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন একটা অখ- সাধনা, এক বিরাট অভিপ্রায়ের মুখে সমস্ত দেশটা এগিয়ে চলেছে।'

জীবনের পড়ন্তসীমায় পৌঁছেও রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে অক্লান্ত। ১৯৩২ সালে ক্লান্ত শরীরে তিনি পারস্য ভ্রমণে যান। এই ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক বিশ্লেষণ আছে যা সত্তরপরবর্তী কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশার অতীত। শরীর জীর্ণ হলেও মন জীর্ণ হয়নি। *পারস্যে* ভ্রমণকাহিনিতে তার প্রচুর চিহ্ন ছড়ানো। সে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যেমন পারস্যরাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, তেমনি মরূপ্রান্তর অঞ্চলে বেদুইনদের তাঁবুতে বেদুইন দলপতির সঙ্গে আলাপে ও সরস আলোচনাতেও– 'আমার বেদুইন নিমন্ত্রণকর্তাকে বললুম যে বেদুইন আতিথ্যের পরিচয় পেয়েছি কিন্তু বেদুইন দস্যুতার পরিচয় না পেলে তো অভিজ্ঞতা শেষ করে যাওয়া হবে না।' এর উত্তরও সম্মানজনক ও সুন্দর– আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানীলোকের গায়ে হস্তক্ষেপ করে না।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পৃথিবীর অসংখ্য দেশের মানুষের নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিশ্বখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ অসংখ্যবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ঘটেছে তার মধ্য দিয়ে। সেই সম্বন্ধসূত্রে তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্বপথিক, বিশ্বমানব। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ার পর তাঁকে বিশ্বমানব দ্রষ্টা শিল্পী হিসেবে অভিনন্দন জানাতে না পারা আমাদের পক্ষে ভীরুতা।

বাঙালি নিছক আনন্দের তাগিদে ভ্রমণ করতে ভালবাসে, সাহিত্যের প্রতি তার প্রীতিও আত্মীয়তুল্য। এই দুই প্রিয়তার সমন্বয় ঘটেছে ভ্রমণসাহিত্যে। সব ভ্রমণবর্ণনাই অবশ্য সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠেনি, আবার সব বৃত্তান্তে পথভোলা পথিকের চিরকালীন জিজ্ঞাসাও নেই। না থাক, আমরা যারা 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না'র ঘূর্ণিতে ঘুরে মরি, তারা ভ্রমণাভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে ভ্রমণসাহিত্যেও ভাণ্ডারে ভিড় জমাবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

জামিরুল ইসলাম শরীফ
কবি, প্রাবন্ধিক

ভাটার টানে জল সরে যাওয়া বনভূমি– খেচর জলচর উভচর সবারই আশ্রয়স্থল

ভ্রমণ

অচেনা সুন্দরীর ট্র্যাজিক ম্যাজিক

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

সুন্দরবন নামটিতে যতটা সৌন্দর্য ঠিক ততটাই সুন্দর তার ভৌগোলিক চেহারা। সেখানে মানুষের প্রতিনিয়ত জীবনসংগ্রামও ঠিক ততটাই ভয়ানক। সেখানে ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীর নিয়ে যে মানুষেরা অহোরাত্র বেঁচে থাকে, ভৌগোলিক সৌন্দর্য তারিয়ে উপভোগ তাদের ভাগ্যে নেই। এই হল পশ্চিমবাংলার বদ্বীপ অঞ্চল সুন্দরবন যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তীর কড়চা। বেহুলার ভেলা ভেসে এসেছিল এখানে নেতিধোপানির ঘাটে। এই সেই সুন্দরবন যার প্রেৰাপটে রচিত হয়েছে অমিতাভ ঘোষের *হাংরি টাইড* অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*। এখানে চরাচর জুড়ে আছে নোনাজলের ঐশ্বর্য যার অনন্ত অসীম জলরাশির মাঝে লুকিয়ে থাকে অগণিত সজীব আর সবুজ। গল্পকারের ভাষায় যা হয়ে ওঠে মূর্ত, ভ্রমণপিপাসুর কলমে যা হয়ে ওঠে আরো প্রাণবন্ত, কালের স্রোতে যার ভূগোল পুরনো হয় না সেই বায়োডাইভার্সিটির অন্যতম নিদর্শন সুন্দরবনে হাজির হলাম আমরা ক'জন। শীতের আলসেমি আর ভোরের রোদ্দুরকে সঙ্গী করে কলকাতা থেকে গাড়ি করে ক্যানিং পেরিয়েই মাত্র একশো কিলোমিটার দূরে গদখালি। কলকাতার কাছেই এমন অনবদ্য উইকএন্ড ডেস্টিনেশান এখনও অনেক বাঙালির না দেখা। ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা নিয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করছে এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। এবার গাড়িকে দু'রাতের মত গদখালির বিশ্বস্ত খোঁয়াড়ে পার্ক করে মালপত্র নিয়ে লঞ্চে উঠে পড়া সকলে মিলে। কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা ছিলাম মোট বাইশ জন।

সুন্দরী গাছে ফুল ধরেছে

গোলপাতা সংগ্রহে নিয়োজিত বনজীবী মানুষ ॥ শিকারী বকের মাছ ধরার অধ্যবসায়

চুলোয় গেল ঝুটঝামেলি, শিকেয় তোলা কুটকচালি।
বন্দী হলাম লঞ্চে ভেসে, সুন্দরবন চারিপাশে।

বিদ্যেধরীর বিস্তৃত পাড়ে লঞ্চ ছিল বাঁধা। একে এক তার মধ্যে আমাদের সঙ্গে উঠল দু'তিনদিনের রসদ। কাতলা ভেটকি পার্শে পমফ্রেট চিংড়ি আর মুরগি। সঙ্গে পানীয়জল– যার বড় অভাব এই সুন্দরবনে। বিদ্যেধরীর এপারে আমরা আর অন্যপারে দৰিণের ব্যস্ততম বাজারশহর গোসাবা। সেখান থেকেও উঠবে কিছু আনাজপাতি। ছোট ছোট নদী দুর্গা দুয়ানী, হোগল, সূর্যভেরী, দত্তা, রায়মঙ্গল, ঠাকুরাণ, গোসাবা– সকলের আঁকাবাঁকা নেটওয়ার্ক চোখে পড়ল গুগলম্যাপের মধ্যে। কিছু পরেই বালি আইল্যান্ড, যেখান থেকে মিষ্টিজল আমাদের ছেড়ে চলে গেল আর শুরু হল নোনাজলের সুন্দরবন। পুবের মিষ্টি আলো গায়ে লাগছে... হালকা শীতের নরম ওম জড়িয়ে জায়গা নিলাম। চোখ রাখলাম বিদ্যেধরীর বিস্তৃত জলরাশিতে। সুখ আর সুখ।

নদীর গায়ে নদী এসে লেগেছে সুন্দরবনে আর সব নদী মিলেমিশে সে যে কি বিশালতা আর সকলের একসঙ্গে সেই বয়ে চলা আর অবশেষে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে আত্মসমর্পণ। সমুদ্রের বিছানায় লুটিয়ে পড়েও নদীর চলার শেষ নেই। সর্পিল গতিতে বয়ে চলে মোহনার মুখে একের সঙ্গে অন্যের সে কি সখ্য! সেখানেও নদীর স্বকীয়তা বর্তমান, ফ্লোরা (flora) আর ফনা (fauna)র বৈচিত্র্যময়তায় ভরপুর সে নদীর শরীর। নদীমাতৃক বাংলার অনবদ্য ট্যুরিস্ট স্পট সুন্দরবনের শীতঋতু জমজমাট হয় সপ্তাহান্তের ট্যুরিস্ট আগমনে।

এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন জোয়ারভাটার টানা পোড়েনে অতিবাহিত হয়। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মত সয়ে গেছে এদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি। এরা জঙ্গল বোঝে, পশুপাখি বোঝে– তবুও প্রকৃতি রুষ্ট হলে এরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছিপনৌকায় মাছ ধরতে গিয়ে কিংবা জঙ্গলে মধু আনতে গিয়ে এরা বাঘের পেটে যায়, সুনামি বা আয়লায় এরা সর্বস্বান্ত হয়। তবুও ভাঙতে ভাঙতে গড়ে ওঠে নতুন হ্যাবিটাট। আবারো জেগে ওঠে সুন্দরবনের ফ্লোরা ও ফনা। যেন পৌরাণিক উপাখ্যানের আগুনপাখি আমাদের এই গর্বের সুন্দরবন। পুড়ে ছাই হয় গিয়ে আবার তার মধ্যে থেকে নতুন করে জন্ম নেয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাবু করে দেয় একে। কিন্তু প্রকৃতি আবারো কোলে টেনে নেয়।

লঞ্চ বা মোটোরাইজড নৌকা ছাড়া স্থলপথে সুন্দরবন যাবার কোন রাস্তা নেই। আমাদের গন্তব্য হল সজনেখালি টাইগার রিজার্ভ অঞ্চল। লঞ্চযাত্রার শুরুতেই কচি ডাবের জল দিয়ে ওয়েলকাম পর্ব সেরে নিলেন আমাদের ট্যুর অপারেটর। তারপরেই হাতে এল শালপাতার বাটিতে করে আলুকাবলি। কখনো চোখ রাখি বিস্তৃত জলরাশিতে আর কখনো বা দু'পাশের ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ঘন সবুজে। আর গল্প শুনি বাংলার গর্বের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। প্রায় এগারোহাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট। জলের কুমীর ঐ বাঘের ভয়ে কাঁটা। এখানে বাঘ নদী পেরোয় নির্বিবাদে। জলের মধ্যে অবিশ্যি কামটের কামড় তাকে খেতে হয় কখনওসখনও। এই বাঘ ছিপনৌকায় মাছ ধরতে আসা মানুষের দল থেকে একজনকে নিঃসাড়ে টেনে নিয়ে যায়, বাকিরা তা জানতেও পারেন না। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের এত হিংস্রতার কারণ হল জঙ্গল কেটে কেটে মানুষের বসতি গড়ে তোলা, নদীর নোনা জলের আধিক্য আর হেঁতাল গাছের ভয়ানক কাঁটা। এই হেঁতাল ঝোপে বাঘ থাকে কিছুটা গা ঢাকা দিয়ে অথচ গুল্ম জাতীয় হেঁতালের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তার সারা শরীর। সুন্দরীগাছের শ্বাসমূলের খোঁচায়

বাঘকে বিভ্রান্ত করতে মৌয়ালদের মাথার পেছনে মুখোশ

গোসাবা থেকে লঞ্চে সুন্দরবন যাত্রার প্রস্তুতি ॥ বনরক্ষীদের সহায়তায় বনের পথে ভ্রমণার্থীদল

জলে কুমীর ডাঙায় বাঘের ভয় উপেক্ষা করে জীবিকার সন্ধানে মানুষ– পোনা ও মধু সংগ্রহকারীদের জীবন সংগ্রাম

কেটে যায় তার পায়ের তলার নরম অংশ। সেখানে আবার নোনাজল লেগে শুরু হয় জ্বলন। তাই বাঘ এখানে অনেকটাই বিবৃদ্ধ।

সবুজ এখানে প্রচুর কিন্তু শাকাহারী জন্তুদের খাবার মত ঘাসপাতা এখানে কম তাই এখানে মানুষ হল বাঘের সহজলভ্য শিকার। চিতল হরিণ আছে তবে তার খাদ্যের প্রাচুর্য নেই, ফলে খাদ্য শৃঙ্খলের অনেকটাই বিপন্ন। এতসব শুনতে শুনতে বেলা পড়ে এল, এবার লঞ্চ @ লঞ্চ। লঞ্চ তখন মধ্যাহ্নভোজের প্রস্তুতিতে গ্যাস্ট্রোমিক গন্ধময়তায় ভরপুর।

বন অফিসের পাশ সংগ্রহকারীদের আনাগোনা

ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছগুলো যেমন দিনের পর দিন সহ্য করে জোয়ারে ধেয়ে আসা সমুদ্রের নোনা জল, ভেজা মাটি আর স্যাঁতস্যাঁতে জলহাওয়া, ডাঙার মানুষেরা বেঁচে থাকে বাঘ কুমীর আর কামটের চোখরাঙানি নিয়ে। তবুও এখানকার সূর্যোদয় কি ভীষণ সুন্দর। আর সূর্যের পাটে যাওয়াটাও ততটাই চোখের সুখ দেয়। তবে চরাচরের সব আলো নিয়ে পশ্চিম আকাশে যখন সূর্যাস্ত হয়, আকাশের লালকমলার খেলা দেখতে দেখতে কবি দার্শনিকরা যতটাই আপুত হন– স্থানীয় মানুষ কিন্তু অপেক্ষায় থাকে পরের সূর্যোদয়ের।

সন্ধ্যের ঝুলে নেমে পড়লাম লঞ্চ থেকে। জায়গার নাম দয়াপুর। সেখানেই আমাদের রাত্রিবাসের আয়োজন। রয়েল বেঙ্গল রিজার্ভ রেসর্টে প্রবেশ করে হাত পা মুখ ধুয়ে ধুমায়িত চা ও গরমগরম ভেটকি ফ্রাই খেয়ে সারাদিনের ধকলটা যেন উড়ে গেল নিমেষে। এরপর পথের ক্লান্তি ভুলে, শক্ত পানীয়সহযোগে আমরা পেরোলাম কিছুটা সময়... হালকা ঠাণ্ডায়– সুন্দরবন জমে বরফ দই ক্ষীর না হলেও বেশ ভাললাগা জড়িয়ে রইল। হোটেলের উল্টোদিকে সজনেখালি অভয়ারণ্য। এখানে জঙ্গল যেন আরো ঘন আর হিংস্র মনে হল। অন্ধকারে এবার নদীর ধারে বসে গল্প শোনার পালা। খলসি গাছের মধু নাকি সবচেয়ে ভাল হয়। মধু যারা সংগ্রহ করে তাদের মউল বলে। ছিপ নৌকায় জঙ্গলে ঢুকে মউলরা হেঁতালের ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে চাকভাঙা মধু আনে। গ্রামগুলি খুব প্রত্যন্ত। মানুষেরাও হতদরিদ্র। কারোর জীবিকা মধু আনা, কারোর বা ঝিনুকে করে বাগদার মীন মেপে নোনা জলে ছেড়ে দিনান্তে কিছু পয়সা রোজগার। তবে মুখ্য ফসল হল ধান। তাই চাষবাসই মূলত প্রধান জীবিকা। ডিসেম্বরের হালকা ঠাণ্ডায় চোখ জুড়ে আসছিল। ডিনারের ডাক পড়ল। গরম রুটি, বেগুনভাজা, বাঁধাকপির ডালনা আর মুরগির মাংস খেয়ে রাতঘুম। পরদিন বেডটি কলিং। বালতির গরমজলের দাম মিটিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। আবারো সাফসুতরা লঞ্চটিতে ফিরে আসা। এসেই দেখি লুচি ভাজার পর্ব শেষ। আমাদের হাতে হাতে লুচি আলুরদম আর চা পৌঁছে গেল। চলতে চলতে দেখি ডাঙার চরে রোদ পোহাতে ব্যস্ত এক মাঝারি কুমীর। লঞ্চ তখন ডিজিটাল ক্লিকে মুখর। কাছেই নাকি সজনেখালি কুমীর প্রকল্প। কিছু পরেই সজনেখালি নজরমিনার। আবারো লঞ্চ থেকে নামার পালা। বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের মন্দিরে পেন্নাম ঠুকে যেতে হয় এটাই রীতি এখানে।

জঙ্গলের রাজা হিসেবে আদি অনন্তকাল ধরে বাঘকে মানুষ সমীহ করে। সুন্দরবনের এই ব্যাঘ্র দেবতা হলেন দক্ষিণ রায় যাকে পুজো করে মানুষ প্রতিনিয়ত তুষ্ট রাখে। উত্তরবঙ্গের তরাই জঙ্গলে যিনি সোনা রায় দক্ষিণবঙ্গে তিনি দক্ষিণ রায়। তাঁর পুজোর সঙ্গে সঙ্গে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য বনদেবী বনবিবির পুজো করে মানুষ। বাউল, মউল, জেলে সকলে জঙ্গলের প্রবেশের আগে পুজো দেয় বনবিবির মন্দিরে। সুন্দরবনের সংস্কৃতির সঙ্গে এই দুইয়ের পুজো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বনবিবি শক্তিরূপিণী মা দুর্গার আরেক রূপ। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে তাঁকে এখানে স্মরণ করে। কত প্রজাতির গাছ এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যে। সব গাছেরাই প্রায় গুল্মজাতীয় (shrub)। গরাণ থেকে গেঁওয়া,

জীববৈচিত্র্যে ভরপুর সুন্দরবনে ফ্লোরা-ফনার অপূর্ব সমাবেশ– শাবকদের আগলে রেখেছে পক্ষীমাতা ॥ শঙ্খলাগা সাপজুটির বিরল দৃশ্য

পাম প্রজাতির হেঁতাল আর গোল গাছের ঝোপ– বাঘের দুই নিরাপদ আশ্রয়

কেওড়া থেকে হেঁতাল, সুন্দরী থেকে গোলপাতা, ধুঁধুল, কাঁকড়া, খাগড়া আরো কতরকমের।

কি অপূর্ব এক বাস্তুতন্ত্র এই সুন্দরবনের! বিশ্বে পরিচিত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবসস্থল রূপে এর খ্যাতিঅখ ্যাতি যতই থাক, বাঘ দেখতে পাওয়া অনেকটাই ভাগ্যের ব্যাপার। বাঘ ছাড়াও জলের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, শুশুক আর চিংড়ির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। রয়েছে গোসাপ, কচ্ছপ, টেরাপিন, গিরগিটি, ব্যাঙ, অজগরের মত নানান প্রজাতির উভচর সরীসৃপেরা। চিতল হরিণের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় বুনো শুয়োর। বাঁদর উঁকি দেয় ঝোপের আড়াল থেকে। আর গাছের ডালে চোখ রাখলেই দেখা যায় কত ধরনের পাখি। জলে মাছ খেতে আসে নানা প্রজাতির বক। ১৭০ প্রজাতির পাখি আছে নাকি এই সুন্দরবনে। মাছরাঙা থেকে শুরু করে কোঁচবক, সারস থেকে শুরু করে পেলিকান, জলপিপি, হেরন, জলমুরগি, ব্রাহ্মণী চিল, পানকৌড়ি সিগাল আ রো কত কি!

ফেরার পথে সুধন্যখালি আর পাখিরালয়। অনেক ঘোরা হল, হাঁটাহাঁটি হল, বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গেল। কিন্তু সে যাত্রায় বাঘ আমাদের অধরা। তবে খেচর উভচর জলচর আর লঞ্চের সহচরদের সঙ্গে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় মন তখন ভরপুর আর আলোআঁধারি নি য়ে জোয়ারভাটার খেলায় মেতে তখনো সুন্দরবনের চরাচর।

হোটেলে ফিরে এসে আদিবাসী নৃত্য আর বাউলগানে মুখর হল সন্ধ্যা, সঙ্গে বনফায়ার। গরম চা আর চিকেন পকোড়াও হাজির হল মুখের সামনে। আবার পরদিনের তোড়জোড়। আরো একবার চেষ্টাচরিত্র হল বাঘের ডেরায় উঁকি দেবার, দোবাঁকি টাইগার প্রজেক্টে অবতরণ হল। তবুও দক্ষিণ রায়ের দেখা মিলল না।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি লঞ্চঘাটের দিকে। নামবার পালা এবার। গোসাবায় নেমে এগিয়ে চলি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত হ্যামিলটন সাহেবের কুঠিবাড়ির দিকে। কিছু ট্র্যাজিক ম্যাজিক আছে এই সুন্দরবনে যা অনায়াসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে এখানে টেনে আনে। তাই গর্ব হয় মনে মনে আবার মন ভারীও হয় এখানকার মানুষদের জন্যে। আবারো উঠবে সুন্দরীগাছের আড়াল থেকে সুন্দর সূর্য এখানে। সেই আলোয় ভেসে যাবে সুন্দরবনের নদনদী। জেগে উঠবে চর। গাছপালার সবুজ আরো আরো সবুজে ভরে উঠবে। সুন্দরবনের নোনা জল আর মিষ্টি জলের টানাপোড়েন লেগেই থাকবে। জনসভা হবে। এখানকার স্থানীয় মানুষজনের উন্নতির প্রতিশ্রুতিতে গর্জে উঠবে সুন্দরবনের অরণ্য। তবুও এরা থাকবে কিছুটা ব্রাত্য, শহর থেকে আরো অনেক পিছিয়ে, অনেকটাই প্রতিকূলতায় আর অনেকটা প্রতিবন্ধকতায়। এটাই নিয়তি এদের।

বিদ্যেধরীর জন্য রেখে এলাম দু'কলম চিরকূট

দু'দুটো দুপুর দিয়েছিলে আমায়– নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়েছিলে বিদ্যেধরী। দুটো রাত রেখেছিলে তোমার সংসারে– বিদ্যেধরী! লোভ দেখালে টাটকা মাছের? আকৃষ্ট করলে পাখির ডাকে? কাছে টানলে সূর্যাস্তের রং দেখিয়ে? বিদ্যেধরী! তোমার কত সহ্যশক্তি। তোমার এ কূল ভাঙে আবার ও কূল গড়ে। বিনষ্ট হয় ইকোসিস্টেম। তুমি নিঃশব্দে নীরবে বয়ে চল এই সুন্দরবনকে আঁকড়ে ধরে।

পরক্ষণেই ভাবি, আমি যে তাকে কিছুই দিয়ে এলাম না? বরং নিঙড়ে নিলাম তাকে... সে আমাকে তৃপ্ত করল তার রূপ-যৌবন সবকিছু দিয়ে। তার টাটকা মাছ, দেশী মুরগির ডিম, খাঁটি মধু, গাছের ফলপাকুড় দিয়ে... কত সাইক্লোন সামলেছে সে। সামলেছে কত বিপর্যয়। আর আয়লা সুনামির সময় বুক দিয়ে আগলেছে আমাদের শহর কলকাতাকে। ফেরার সময় লঞ্চে বসে বসে এতসব ভাবছিলাম।

হঠাৎ কে যেন ধাক্কা দিয়ে বলল, দিয়ে যাও কিছু। লঞ্চ থেকে নেমে দেখি ক্লান্ত দুপুরে সূর্যের সোনালী রোদ লেগে রয়েছে ছেঁড়া সোয়েটার পরা ছোট একটি ছেলের চোখের তারায়। নাক দিয়ে ঝরছে অবিরত ধারা আর মুখ ফুটে কথা নেই তার, বোবা সে। দিলাম তাকে মোটে দশটা টাকা। দশ টাকার নোট নিয়ে তার চোখেমুখে অপার খুশির জোয়ার নামল যেন। গোসাবার লঞ্চঘাট তখন ফিরতি জনতার ভিড়ে থৈ থৈ। আবার শুরু হল ঘরে ফেরার গান।

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
ভারতের পর্যটক, কথাকার

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বনজীবী মানুষের আরাধ্য দেবী বনবিবি– শক্তিরূপিণী দুর্গার আরেক রূপ ॥ সুন্দরবনে সূর্যোদয় ॥ সজনেখালি নজর মিনারের প্রবেশপথ

নতুন
HARPIC®
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS

ছোটগল্প

হাঁটাবাবা

পলাশ মাহবুব

বাবা হাঁটেন।

হাঁটাটাই তাঁর দিনের একমাত্র কাজ। শুধু দিন বললে ভুল হবে। তিনি রাতে হাঁটেন না, বিষয়টা এরকম না। রাতেও হাঁটেন। তবে তাঁর হাঁটা শুরু হয় সকাল থেকে। সকালে হাঁটা শুরু করেন, যেখান থেকে শুরু করেন বুমেরাং-এর মত আবার সেখানেই ফিরে আসেন। ফিরে আসতে আসতে কখনো সন্ধ্যা কখনো গভীর রাত।

তিনি হাঁটেন। তাঁর পেছন পেছন হাঁটে আরও অনেকে। তারা বাবার লোক না। আবার তাদেরকে বাবার লোক বললেও ভুল বলা হবে না। কারণ বাবার লোকই যদি না হবেন, তাহলে তিনি বাবা হলেন কিভাবে!

সব বাবারই কিছু লোক থাকে। লোক মানে অনুসারী। যে বাবার যত লোক তিনি তত বড় বাবা।

বাবা কি তবে পীর-ফকির?

এমন দাবি বাবা নিজে কখনো করেননি।

অস্বীকার করেছেন এমনটাও শোনা যায়নি।

বাবা হাঁটার সময় তাঁর পেছনে যারা হাঁটে তিনি তাদের কাউকে ঘর থেকে ডেকে আনেননি। সবাই নিজের ইচ্ছা আর প্রয়োজনে তাঁর পিছু নিয়েছে। এটা ঠিক।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ থেমে যান বাবা। পেছন ফিরে তাকান। তাকিয়ে তার পেছনের মানুষদের মানে যারা তার পেছনে হাঁটছে তাদের দেখেন। তাদের মধ্য থেকে যার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবেন, 'দে'– সবার ধারণা তার সমস্যা মিটে গেল। বাবা যার দেওয়া পানি খাবেন তার মনের বাসনা পূরণ হয়ে যাবে। বাবা যে বোতলের পানি খাবেন, সেই বোতলের অবশিষ্ট পানি যে খাবে তার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। এমন কথা প্রচলিত আছে।

আবার এটাও ঠিক, হাঁটা থামিয়ে তিনি কখনো জানতে চাননি, আপনারা কারা? আমার পেছন পেছন হাঁটার কি উদ্দেশ্য? আমি কোনও বাবাটাবা না। কোমরে বাতের ব্যথা তাই হাঁটাহাঁটি করি। যান, যার যার কাজে যান। আর হাঁটতে যদি হয়, রমনা পার্কে গিয়ে হাঁটেন। নির্মল বায়ু সেবন করতে করতে হাঁটেন। আমার পেছনে কি? পেছন পেছন এক পাল লোক হাঁটা আমার পছন্দ না।

বাবা যেহেতু কোনটাই করেন না, পুরো ব্যাপারটি তাই এক ধরনের রহস্যের মধ্যে পড়ে যায়। যেমন রহস্য আছে তাঁর নাম নিয়ে।

বাবার নাম হাঁটাবাবা হল কি করে এ বিষয়টি পরিষ্কার না। এটা কি বাবার, বাবার দেওয়া নাম নাকি নিজের দেওয়া সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। যারা তাঁর পেছনে হাঁটেন তাদেরও বিষয়টি অজানা। সবাই শুনেছে। সবাই জানে হাঁটাবাবা তাঁর নাম।

তবে ভাসাভাসা একটা কথা প্রচলিত আছে, সবসময় হাঁটার ওপরে থাকেন বলে তার নাম হয়ে গেছে হাঁটাবাবা। লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে যা এখন সবার মুখে মুখে। তাছাড়া সব বাবার একটা নাম থাকতে হয়। কেউ 'ফুঁবাবা'। তার এক ফুঁয়ে দুনিয়ার যে-কোনও শক্ত রোগ মুহূর্তে নাই হয়ে যায়। খাটিয়ায় করে আনা প্যারালাইজড রোগীও ফুঁয়ের কল্যাণে পায়ে হেঁটে বাড়ি চলে যায়। এমন গল্পের কল্যাণে কারও নাম ফুঁবাবা।

'টোকাবাবা' আছে একজন। রোগ কিংবা সমস্যার কথা শুনে একটু বিড়বিড় করে কি যেন বলেন, তারপর রোগীর মাথায় ছোট্ট করে দুটো টোকা দেন। প্রবলেম যাই থাকুক টোকার কাছে তার টেকা দায় হয়ে যায়। এতবড় একজন সাধকের তো একটা বিশেষণ থাকতে হয়। তার নাম হয়ে যায় টোকাবাবা।

'হাঁটাবাবা' এই বাবার তেমন নাম। এর বেশি কিছু কেউ বলতে পারে না। কেউ অবশ্য জানতে চায়ও না। বাবার নাম নিয়ে গবেষণা করা তাদের উদ্দেশ্য না। তাঁর পেছনে হাঁটতে পারছে এই তো বেশি। ইতিহাস জানার চেয়ে বাবার পেছনে হেঁটে মনোবাসনা পূর্ণ করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাবার নাম বিষয়ে বেশি প্রশ্নও তাদের পছন্দ না।

বাবার নাম নিয়া প্রশ্ন করবেন না। বাবার নাম নিয়া প্রশ্ন করা মানে নিজের বিপদ নিজে ডাইকা আনা। আমরা বাবার কাছে আসি বিপদ থেকে উদ্ধার পাইতে, নতুন কইরা বিপদে পড়তে না।

পেছনে হাঁটা মানুষেরা যেহেতু বাবার নাম বিষয়ে কোনও প্রশ্ন পছন্দ করে না তাই বিষয়টি আর আগায় না। পেছনেই পড়ে থাকে।

অন্যদিকে এগিয়ে যান বাবা। তিনি হাঁটেন। তবে এক রাস্তায় প্রতিদিন হাঁটেন না। এই শহরে তো আর রাস্তার অভাব নেই। তেমনি বাবাভক্ত মানুষেরও কমতি নেই। একেক দিন একেক রাস্তা দিয়ে হাঁটেন তিনি। যে কারণে তাঁর পেছনের মানুষরাও পাল্টায় রোজ। দুএকজন কে অবশ্য পাওয়া যাবে যারা বেশ কিছুদিন ধরে বাবার পেছনে হাঁটছেন।

সেটারও কারণ আছে। সবাই কোনও না কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বাবার পেছনে হাঁটে। কিন্তু সবার কাজ তো আর একদিনে হয় না। বাবা তো একজনমাত্র মানুষ। তাই যাদের লক্ষ্যপূরণে একটু বেশি সময় লাগে তারা কাজ হওয়ার আগ পর্যন্ত বাবার পেছনে হাঁটে। সেটা হতে পারে দুই দিন কিংবা দুই সপ্তাহ।

হাঁটার সময় বাবা কিছু খান না।

কোনও ধরনের খাদ্যদ্রব্য তাঁর সঙ্গে থাকে না। কিন্তু যারা তাঁর পেছনে হাঁটে তাদের সবার কাছে কিছু না কিছু থাকে। বাবাকে খুশি করতে সঙ্গে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসে তারা। হতে পারে সেটা কোনও চাইনিজের দামী লাঞ্চ বক্স কিংবা নান্না মিয়ার মোরগ পোলাও। অনেকে নিজের বাড়ির পোষা মোরগ-মুরগি থেকে শুরু করে মাচার কচি লাউ নিয়েও বাবার পেছনে হাঁটে। বরিশাল থেকে তো একবার এক লোক লঞ্চে করে একটা গরু নিয়ে ঢাকায় চলে এল। বাবা শুধু পানি খাবেন এটা কেমন কথা। বাবাকে গরুর খাঁটি দুধ খাওয়ানো তার উদ্দেশ্য। যে কারণে নিজের পালা গাভী নিয়ে চলে এসেছে সে। বাবা হাঁটছেন, গরু নিয়ে সেই লোকও হাঁটছে। পানির বদলে বাবা দুধ না খেলেও বাবার সেবায় গাভী দিয়ে গেছে সে।

বাবার নাম শুধু ঢাকা শহরে নয়, এর বাইরে আরও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষ যেহেতু একটু বেশি বিশ্বাসী, তাই তাদের ভিড়টাও হয় বেশি এবং বাবার প্রতি তাদের ভালবাসাও থাকে প্রবল। যে কারণে বাবাকে খুশি করতে তাদের আয়োজনটা একটু বড় হয়। হাঁটার সময় তাদের হাতের বোঝাটা একটু বেশি ভারি থাকে।

কিন্তু সেস বের কিছুই খান না বাবা। খাওয়ার মধ্যে শুধু পানি।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ থেমে যান বাবা। পেছন ফিরে তাকান। তাকিয়ে তার পেছনের মানুষদের মানে যারা তার পেছনে হাঁটছে তাদের দেখেন। তাদের মধ্য থেকে যার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবেন, 'দে'। সবার ধারণা তার সমস্যা মিটে গেল। বাবা যার দেওয়া পানি খাবেন তার মনের বাসনা পূরণ হয়ে যাবে। বাবা যে বোতলের পানি খাবেন, সেই বোতলের অবশিষ্ট পানি যে খাবে তার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। এমন কথা প্রচলিত আছে।

আর আছে পুরতনা সেই সমস্যা। বাবার রহস্য। তিনি নিজে কখনো এমন দাবি করেননি। অন্তত কেউ তাকে বলতে শোনেনি যে, তার খাওয়া পানি খেলে সব বিপদআপদ, রোগ-বালাই থেকে মুক্তি মিলবে। আবার তিনি বিষয়টিকে নাকচও করে দেননি। কারণ তিনি কোনও বোতলের পানি পুরোটা খান না। তা এক লিটারের বোতল হোক বা হাফ লিটারের। পুরোটা খান না ভাল কথা। বোতলটা আবার মালিকের হাতেই ফিরিয়ে দেন। তারচেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে বোতলের পানি ছাড়া অন্য পানি তিনি খান না। তাও আবার একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির মিনারেল ওয়াটার। অনেকে মাঝেম ধ্যে জুসটুস দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাবা তা গ্রহণ করেননি।

মুখে কিছু না বললেও লোকজন তো আর অবুঝ না। এত নিয়মকানুন যেহেতু মানা হয় তার মানে ঘটনা আছে। বিরাট কোনও কেরামতি। বাবা তো আর মুখ ফুটে কোন কথা বলবেন না। মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে আগায় সবাই।

এ পদ্ধতিতে অনেকে ফল পেয়েছে এমন কথা মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু যারা ফল পেয়েছে তারা যেহেতু আর বাবার পেছনে নেই তাই হাতে নাতে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সাক্ষীপ্রমাণের বিষয় এটা না। সাক্ষীপ্রমাণ দিয়ে মামলা জেতা যায়, বাবার করুণা পাওয়া যায় না। বিষয়টা পুরোই বিশ্বাসের। আর আশপাশে বিশ্বাসী লোকেরও অভাব নেই। বাবার পেছনের লাইনটা তাই কখনো ছোট হয় না।

বাবা যে কতবড় বাবা তা বোঝাতে অনেকে তার পানি খাওয়ার বিষয়টিও তুলে আনে। তার হয়ে যুক্তি দেওয়ার লোকের কি আর অভাব হয়!

সারাদিন বোতলকে বোতল পানি খায় বাবা। দেখছেন না আপনারা?

মাথা উপরনিচ ক রে সম্মতি জানানোর লোক দাঁড়িয়ে যায় অনেক। তারা দেখেছে। নিজের চোখে দেখেছে, বাবা লিটারকে লিটার পানি খেয়ে ফেলেন এক হাঁটায়।

তাইলে এবার বলেন, এত যে পানি খায় বাবা, হাঁটার সময় ছোট বাথরুম করতে দেখছেন কখনো তারে?

এবার মাথা ডানবাম ক রে তারা জানায়, কখনো দেখেনি।

বোঝেন ব্যাপারটা। তার মানে উনি কিছু একটা। আপনে-আমি দুই বোতল পানি খাইয়া দেখি। পাঁচ মিনিটের মইধ্যে দৌড় দিয়া বাথরুমে যাইতে হবে। বাথরুমে যাইতে না পারলে পেটের ব্যাডার ফাইটা মরতে হইব। কিন্তু বাবার বেলায় সেইটা হয় না। কারণ, উনি তো আর আপনারআমার মত না। বাবা হইলেন বিরাট সাধক। ওপরের ক্ষমতা না থাকলে এইটা সম্ভব না।

প্রতিদিন হাঁটার ফাঁকে আট থেকে দশবার পানি খান বাবা। এর বেশি না। তাই একদিনে পেছনে হাঁটা সবার পানি তিনি পান করতে পারেন না। অনেকে সারাদিন পেছনে হেঁটেও বাবার কৃপাদৃষ্টি লাভে ব্যর্থ হয়। তাই তাদের পরের দিন আসতে হয়। পরের দিনও না হলে তার পরের দিন। এভাবে কিছু লোক থাকে যারা দিনের পর দিন বাবার পেছনে হাঁটছে তাঁর করুণা লাভের আশায়। এসব কারণে বাবার লটবহর একেবারে ছোট না। পঞ্চাশ থেকে সত্তরজনের একটা কাফেলা সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকে। ভিড় সামলানোর জন্য কয়েকজন ভলান্টিয়ারও থাকে অবশ্য। তারা বাবার নিজস্ব লোক নাকি নিজ উদ্যোগে করে বিষয়টা পরিষ্কার না। তবে পানি বাদে বাবার জন্য অন্য যেসব খাবার আনা হয় সেগুলো এক সময় তাদের হেফাজতে চলে যায়। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় তারা বাবার লোক হতে পারে। তবে নিশ্চিত নয়। বাবা তো আর নিজে থেকে কিছু বলেননি। আর হাঁটার সময় এতকিছু নিয়ে ভাবতে যায় কে!

সবার তখন একটাই ভাবনা, বাবার কাছে কাছে হাঁটতে হবে। তাঁর চোখে পড়তে হবে। মাথা তুলে শুধু একবার যদি বলেন, 'দে', তাহলেই লক্ষ্য পূরণ। সব মুশকিল আছান। এই চিন্তায় থাকে সবাই।

বাবার পেছনে যারা হাঁটেন তাদের সবাই যে গরিব মানুষ এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। অবাক করার মত সম্পদের মালিক এমন অনেককে তাঁর পেছনে হাঁটতে দেখা যায়। যারা সর্দিকাশির জন্য ব্যাংককসি ঙ্গাপুর করতে পারেন, সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তারাও আসেন। বাবার করুণা লাভের আশায় হাঁটেন।

তাদের অবশ্য না হাঁটলেও চলে। কারণ, তারা তো আর শুধু দু'পায়ের মালিক না। তাদের গাড়ি আছে। কিন্তু যেহেতু বাবা হাঁটছেন তাদেরও হাঁটতে হয়। তারা তো আর গাড়িতে বসে থাকতে পারেন না। বাবার পেছন পেছন তারাও হাঁটেন। আর পেছনে পেছনে থাকে তাদের গাড়ি। দেখলে মনে হতে পারে ছোট কোনও রাজনৈতিক দলের মিছিল যাচ্ছে। যাদের কর্মী সংখ্যা খুব বেশি না আবার টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করবে অর্থনৈতিক অবস্থাও তত ভাল না– এমন একটা দল কোনও দাবিতে মিছিল করছে। তবে মৌন মিছিল। সবার সামনে দলের নেতা। জটাধরা ল ম্বা চুল আর মুখভর্তি দাঁড়ি নিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছেন। দাবি না মানায় খুবই হতাশ তিনি। হতাশার কথা কাকে বলবেন, মাথা নিচু করে সেটাই ভাবছেন।

বাবার হাঁটার নির্দিষ্ট কোনও রুট নেই। রুট পারমিট আছে কিনা সেটাও স্পষ্ট না। অবশ্য দু'পায়ে হাঁটার জন্য রুট পারমিটের প্রয়োজন পড়ে না। আর যারা বাবাস্থানীয় তাদের বেলায় তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু বাবা হাঁটলে রাস্তায় কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়। তা হতেই পারে, কারণ দলবল নিয়ে হাঁটলে একটু সমস্যা হয়ই। তাছাড়া উৎসুক লোকের তো অভাব নেই। কোনও কিছুর প্রত্যাশা ছাড়া হাঁটার কাফেলায় কিছুক্ষণের জন্য যুক্ত হওয়ার লোকও মিলে যায় কিছু। সব মিলিয়ে একটা জটলা তৈরি হয়।

সমস্যা বাবারও হয়। মাঝে মধ্যে পুলিশ এসে ডিস্টার্ব করে। একদিন এক তরুণ পুলিশ সার্জেন্ট এসে খুবই বাজে ব্যবহার করল।

এইখানে গ্যাদারিং কিসের? কোন দলের মিটিং?

বাবা সবেমাত্র হাঁটা থামিয়ে একজনের ওপর পানি পানের দৃষ্টি দিয়েছেন। সেই লোক তো খুশিতে ডগমগ। বাবা তার দেওয়া পানি খাবেন! এমন সময় পুলিশ অফিসারের এমন খতরনাক প্রশ্ন।

নাউজুবিলাহ। মিটিং হতে যাবে কেন! এখানে বাবা থেমেছেন। তিনি পানি পান করবেন। পানি পানের বিরতি। বাবা যার পানি খাবেন সেই লোক ফিসফিস করে পুলিশ অফিসারকে বলল। এমনভাবে বলল যাতে বিষয়টা বাবার কানে না যায়। বাবা শুনলে বেইজ্জতি।

তাতো বুঝলাম। তিনি কোন পার্টির? সরকার নাকি অপজিশন। অপজিশন হলে রাস্তায় কোনও মিছিলমিটিং হ বে না। লাঠিচার্জ হবে। মিটিং করতে হলে ওপরের অর্ডার লাগবে।

ছি! ছি! বাবা দলের হতে যাবে কেন! বাবা কোনও দলের নন। তিনি দলের উর্ধ্বে। তিনি মানুষের খেদমতে হাঁটেন। হেঁটে হেঁটে মানুষের খেদমত করেন। তার মত বাবা আর একটা পাবেন না। অন্য বাবাদের দেখা পেতে তাদের আস্তানায় যেতে হয়। আর আমাদের বাবা নিজে হেঁটে হেঁটে মানুষের খেদমত করেন। এমন বাবা এই শহরে আর নাই।

ও আপনারা হাঁটা পার্টি। তা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? হাঁটা শুরু করেন। দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়াবেন না। তাড়াতাড়ি হাঁটেন। এখান দিয়ে ভিআইপি যাবে। রাস্তা ক্লিয়ার করেন। বলেই জোরে জোরে বাঁশি বাজাতে লাগলেন।

আবার উল্টো ঘটনাও আছে।

ধমকাতে এসে পুলিশ অফিসারও বাবার ভক্ত হয়ে গেছে এমন কেসও কম না। দু'দিন পরে সেও বোতল বগলে নিয়ে বাবার পিছু নিয়েছে। হাতপা ধরার অব স্থা। বাবা প্রচারবিমুখ বলে এসব কথা কেউ জানে না।

হাঁটার সময় বাবা কোনও কথা বলেন না।

সারাদিনে গুণে গুণে আট থেকে দশটা কথা বলেন। তাও একটিমাত্র শব্দ, 'দে'। তাও আবার পানি খাওয়ার সময় হলে। এছাড়া পুরোটা সময় তার মাথা থাকে নিম্নমুখী। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন মাটির মত মানুষ 'হাঁটাবাবা'। তাঁর ভক্তরা বলে, মাটির দিকে তাকিয়ে বাবা আসলে এই জগতের রহস্য খুঁজে বেড়ান। কিছু পান আর কিছু পান না। তাই প্রতিদিনই পথে নামেন তিনি।

তার পেছনে যারা হাঁটে তাদেরও এ নিয়ম মানতে হয়। কোনও কথা হবে না। নিভৃতে চলাচল। নিভৃতে সেবা। অন্যকে বিরক্ত না করে নিজের কাজ করা।

সারাক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকলেও বাবাকে কিন্তু অসচেতন বলা যাবে না। জাতে মাতাল তালে ঠিক। যারা বাবাকে রাস্তায় হাঁটতে দেখেছেন এবং তাঁর এই হাঁটাচলা যাদের বিরক্তির কারণ হয়েছে তাদের কারও কারও যুক্তি এরকম। কারণ সব সময় রাস্তার রং সাইড দিয়ে হাঁটেন তিনি। গাড়ি যেদিক দিয়ে আসে ঠিক তার উল্টো দিক দিয়ে। কখনো এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাদের যুক্তি উল্টো দিক দিয়ে হাঁটার কারণ পেছন দিক দিয়ে যাতে কোনও গাড়ি-ঘোড়া গায়ের ওপর উঠে না যায়, এজন্য এই পদ্ধতি। পাগল হলেও ভাত ফালায় না।

বাবাকে কেউ বলে সাধক কেউ বলে ভ- আর কেউ কেউ বলে পাগল। পাগল না হলে কি রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়!

যে যাই বলুক, বাবা কিছু বলেন না। তিনি তো কথাই বলেন না। তিনি জানেন বোবার কোনও শত্রু নাই। রহস্যময় নীরবতাকে সঙ্গী করে হেঁটে চলেন বাবা। তাঁর হাঁটা থামে না।

তাঁর পেছন পেছন হাঁটে আরও অনেকে।

এক যাত্রায় দুই ধরনের যাত্রী।

পেছনের মানুষদের লক্ষ্য ধরা গেলেও বাবার উদ্দেশ্য পরিষ্কার না।

পলাশ মাহবুব ছোটগল্পকার

সারাদিনে গুণে গুণে আট থেকে দশটা কথা বলেন। তাও একটিমাত্র শব্দ, 'দে'। তাও আবার পানি খাওয়ার সময় হলে। এছাড়া পুরোটা সময় তার মাথা থাকে নিম্নমুখী। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন মাটির মত মানুষ 'হাঁটাবাবা'। তাঁর ভক্তরা বলে, মাটির দিকে তাকিয়ে বাবা আসলে এই জগতের রহস্য খুঁজে বেড়ান। কিছু পান আর কিছু পান না। তাই প্রতিদিনই পথে নামেন তিনি।

প্রবন্ধ

বরেন্দ্র অঞ্চলে নজরুল

মুকুল কেশরী

বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অবিভক্ত ভারতের পূর্ব বাংলায় প্রথম পদার্পণ করেন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আসানসোলের রুটির দোকান থেকে দারোগা কাজী রফিজউল্লাহর সঙ্গে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার কাজীর সিমলা গ্রামে। এ পদার্পণের মধ্য দিয়ে কবির পূর্ব বাংলা সফর শুরু। এর পরে কবি ১৯২৫ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন। তাঁর শেষ এবং স্থায়ী সফর ঢাকায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। বেশ কিছু জেলায় তিনি একাধিকবার গিয়েছেন এবং একাধিক দিন অবস্থান করেছেন। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম বরেন্দ্রবঙ্গের কোন কোন স্থান সফর করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করা; কেন এসেছিলেন, কখন এসেছিলেন তা জানা। বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বাক্যবন্দী করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

নজরুল বরেন্দ্র অঞ্চলের যে জেলায় প্রথম পা রাখেন সেই সৌভাগ্যবতী জেলাটির নাম কুড়িগ্রাম। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি নজরুল এখানে আসেন। কুড়িগ্রাম হাই স্কুলের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের উদ্যোক্তারা কবিকে আমন্ত্রণ জানালে নজরুল কুড়িগ্রামে এসেছিলেন। দার্জিলিং মেইলে রাত তিনটায় পার্বতীপুর স্টেশনে পৌঁছলে কুড়িগ্রাম হাই স্কুলের ছাত্র নজরুল-ভক্ত মাহফুজুর রহমান খান ও তার বন্ধু খেদমতউল্লাহ কবিকে অভ্যর্থনা জানায়। অন্য ট্রেনযোগে ভোরবেলায় তারা কবিকে নিয়ে কুড়িগ্রামে পৌঁছে।

> হারাগাছ মাদ্রাসা মাঠে কবিকে একনজর দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে সর্বশ্রেণির জনগণ ছুটে এসে মাদ্রাসামাঠ জনকাননে পরিণত করে। তরুণ সংঘের পক্ষ থেকে কবিকে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দেওয়া হয়। মানপত্রে লেখা ছিল 'হাবিলদার কবি নজরুল ইসলামের হারাগাছে শুভাগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি, হে কবি, আমপারা পড়া হামবড়াদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তোমার অধঃপতিত সমাজের প্রতি খেয়াল রাখিও। তাহারা মৃতপ্রায়। তোমার অগ্নিবীণার ঝংকার জাগরিত হোক। অতীত গৌরব ফিরিয়া পাক। ইহাই আমাদের কাম্য।'

কবি মিলাদ মাহফিলে শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, ধর্ম ও নবী চরিত্রের ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন। যদিও মিলাদ মাহফিলের পরদিন কবির চলে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এলাকাবাসীর অনুরোধে দু'একদিন থেকে যান। কবির সম্মানে কুড়িগ্রাম শহরের বাজার প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। কবি কংগ্রেস রাজনীতির সমর্থনে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন; শ্রোতাদের অনুরোধে গানও গেয়ে শোনান। কলকাতা ফেরার দিন তিনি ছাত্রদের নিয়ে বৈঠক করেন– কাব্য সাহিত্য শিল্প ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং জনগণের অনুরোধে বেশ ক'টি গান গেয়ে শোনান। ফেরার সময় বিপুল জনতা স্টেশনে কবিকে বিদায় জানায়।

রংপুর কারমাইকেল কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্র কবি নজরুলের বন্ধু। কবি যখন কুড়িগ্রাম আসেন, সাতকড়ি মিত্র তাঁর কলেজের ছাত্র কাজী মো. ইদ্রিস ও আজিজকে একটি চিঠি দিয়ে নজরুলের কাছে পাঠান। চিঠি পেয়ে নজরুল পরদিন রংপুর চলে আসেন। অধ্যাপক মিত্রের ইচ্ছে ছিল, কবিবন্ধুকে সংবর্ধনা প্রদান করবেন কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের আপত্তি থাকায় কলেজে সংবর্ধনা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কবিকে নিয়ে যাওয়া হয় মুন্সিপাড়া। পরদিন ডেভিড হেয়ার মুসলিম হোস্টেলে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেদিন ইদ্রিসের বাড়িতে কবি চাচ ক্রে যোগ দেন। কবি এখানে কয়েকদিন ছিলেন। রংপুরে নজরুলের প্রথম আসার সময়টা হবে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে। কুড়িগ্রাম এসেছিলেন ১৫ ফেব্রুয়ারি। কুড়িগ্রামে দু'একদিন থেকে তিনি রংপুর গিয়েছিলেন। কাজেই ধরে নেওয়া যায় ১৭ অথবা ১৮ ফেব্রুয়ারি নজরুলের প্রথম রংপুর ভ্রমণের সময়সীমা।

এরপর কবি দিনাজপুর আসেন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য। বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কবি সংগীত পরিবেশন করেন। কবির প্রথম দিনাজপুর আগমন সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি তথ্য জানা যায় না।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ দ্বিতীয়বার কবি দিনাজপুরে আসেন জেলা প্রজা কনফারেন্সে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চাপে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থ অবস্থায় কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেনে দিনাজপুর পৌঁছন। কৃষ্ণনগর থেকে আনওয়ার হোসেনকে লেখা কবির চিঠি থেকে তাঁর দিনাজপুর আসার কথা জানা যায়। দিনাজপুরের ডেরাডাঙ্গিতে জননেতা আনোয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশনে কবি উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এমএলসি, মো. কাদের বক্স এমএলসি ও শ্রী নিশীথনাথ কুণ্ডু জেলা কংগ্রেস সভাপতি অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সম্মিলন দু'দিন ধরে চলে। ১০ মার্চ কবি মাদারীপুরের উদ্দেশ্যে দিনাজপুর ত্যাগ করেন ।

১৯২৮ সালের ২৬ নভেম্বর কবি দ্বিতীয়বার রংপুরের হারাগাছে আসেন একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পূর্বপরিচিত আকবর আলীর আমন্ত্রণে। ওইদিন রংপুর স্টেশনে পৌঁছলে কবিকে নানা জয়ধ্বনিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়। স্টেশন থেকে মোবারক আলীর বাসায় পৌঁছলে কবিকে দেখার জন্য মানুষের ভিড় জমে যায়। হারাগাছের ফতোয়াবাজ ব্যক্তিরা কবির বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে যায়। তারা জনগণকে বলছে নজরুল কাফের, নজরুলের অনুষ্ঠানে যারা যাবে তারাও কাফের। মোল্লাদের অসত্য প্রচারণা উপেক্ষা করে মোবারক আলীর দল রংপুর স্টেশন থেকে বুইক গাড়িতে করে বিরাট বাই সাইকেল শোভাযাত্রায় কবিকে হারাগাছে নিয়ে আসে। শোভাযাত্রার বহর দেখে মোল্লারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

হারাগাছ তরুণ সংঘের সদস্যদের মধ্যে এমদাদ আলী, আজাবুদ্দিন, মেছের আলী, মন্তাজ আলী, আবুল কাশেম, তমিজ উদ্দিন, ওসমান গনি, ডা. নিশিকান্ত রায় , ভোলা প্রামাণিক, কালে খাঁ কবিকে নিয়ে মেতে উঠেন এবং কবির প্রতি নজর রাখেন। ২৭ নভেম্বর মোবারক আলী ও তার দলবল কবিকে নিয়ে দু'ঘণ্টার জন্য শিকারে বের হন।

বিকেলে মাদ্রাসা মাঠে (বর্তমান হাই স্কুল) কবির সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। কবিকে একনজর দেখার জন্য দূরদূরা ন্ত থেকে সর্বশ্রেণির জনগণ ছুটে এসে মাদ্রাসামাঠ জনকাননে পরিণত করে। তরুণ সংঘের পক্ষ থেকে কবিকে সোনার দোয়াতকলম উপহার দেওয়া হয়। মানপত্রে লেখা ছিল 'হাবিলদার কবি নজরুল ইসলামের হারাগাছে শুভাগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি, হে কবি, আমপারা পড়া হামবড়াদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তোমার অধঃপতিত সমাজের প্রতি খেয়াল রাখিও। তাহারা মৃতপ্রায়। তোমার অগ্নিবীণার ঝংকার জাগরিত হোক। অতীত গৌরব ফিরিয়া পাক। ইহাই আমাদের কাম্য।' এখানে কবি বক্তৃতা করেন ও কয়েকটি গান গেয়ে শোনান। তাঁর বিখ্যাত মান্দ কাওয়ালি– 'বাজলো কিরে ভোরের সানাই' হারাগাছে লেখা। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মৌলবী হাবিবুর রহমান। কবি হারাগাছে 'ভোরের পাখি' ও হাসনা হেনা ফুল নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেন। ২৮ নভেম্বর একইপথে রংপুর হয়ে কবি কলকাতা রওনা দেন।

কবি নজরুল রাজশাহীতে আসেন ১৯২৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর। রাজশাহীর মুসলিম ক্লাবের সদস্যরা কবিকে রাজশাহীতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। রাজশাহীর কৃতিসন্তান মাদার বক্স সেসম য়ে কলকাতায় আইন অধ্যয়ন করছিলেন। তাঁর মাধ্যমে কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অবশ্য গোলাম সাকলায়েন 'রাজশাহীতে নজরুল' প্রবন্ধে কবির রাজশাহী আগমন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বলে দাবি করেন। সাপ্তাহিক *সওগাত*এ এব্রিষ য়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের রাজশাহী সফর এবং পরবর্তী অন্যান্য দিনের কর্মসূচীর বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ পায়। সংবাদটি প্রকাশ পায় ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৮। তাতে প্রমাণিত হয়, কবি ১৯২৮ সালেই রাজশাহী এসেছিলেন। নজরুলগ বেষক রফিকুল ইসলাম ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৮-কে সমর্থন করেন।

রাজশাহীর মুসলিম ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসের দু'তিনদিন পূর্বে কবিকে আনার জন্য হাকিম খান চৌধুরী, নাবালক মিয়া ও আজিজুল ইসলাম কলকাতা যান। কলকাতা থেকে ট্রেন নাটোর পৌঁছলে সেখান থেকে মোটরে করে কবিকে রাজশাহীর মুসলিম ক্লাব প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। কবির সঙ্গে ছিলেন যুবনেতা সৈয়দ বদরুদ্দোজা, কবি বন্দে আলী মিয়া ও কবি শাহাদাৎ হোসেন। কবির রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয় ব্যারিস্টার আশরাফ আলী চৌধুরীর 'চৌধুরী দালানে'। আশরাফ আলী চৌধুরী হেতেম খাঁ মহলার জমিদার ছিলেন ।

জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে বিকেলে ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা জজ নুরুননবী চৌধুরী। ক্লাবের কর্মকর্তারা মুসলিম ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যআদর্শ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সবার বক্তব্যেই কবি নজরুলকে অভিনন্দিত করা হয়। কবিও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সংগীত পরিবেশন করেন।

রাজশাহী কলেজের ফুলার হোস্টেলের মুসলিম ছাত্ররা কবিকে সংবর্ধনা জানায়। কলেজ অধ্যক্ষ টিটি উইলিয়াম নানাভাবে ছাত্রদের সহায়তা করেন। অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্বও করেন। উপস্থিত ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে কবি ভাষণ দেন এবং গান গেয়ে সবার মনপ্রাণ জয় করেন। বিকেলে কাদিরগঞ্জ বেলতলা হাউসে গানের আসরে কবি কয়েকটি ইসলামী গান পেশ করে মৌলবীমাওলানা দের মন জয় করলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে তারা কবিকে জড়িয়ে ধরেন। সন্ধ্যে সাতটায় ভিক্টোরিয়া রঙ্গমঞ্চে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ভিক্টোরিয়া রঙ্গমঞ্চ নাম বদলে প্রথমে 'প্রমথনাথ টাউন হল', দ্বিতীয়বার 'অলোকা' এবং তৃতীয়বার 'স্মৃতি' হয়ে এখন ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

১৭ ডিসেম্বর রাজশাহী কলেজের ফুলার হোস্টেলের মুসলিম ছাত্ররা কবিকে সংবর্ধনা জানায়। কলেজ অধ্যক্ষ টিটি উইলিয়াম নানাভাবে ছাত্রদের সহায়তা করেন। অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্বও করেন। উপস্থিত ছাত্রজনতার উ দ্দেশ্যে কবি ভাষণ দেন এবং গান গেয়ে সবার মনপ্রাণ জয় করেন। বিকেলে কাদিরগঞ্জ বেলতলা হাউসে গানের আসরে কবি কয়েকটি ইসলামী গান পেশ করে মৌলবীমাওলানা দের মন জয় করলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে তারা কবিকে জড়িয়ে ধরেন। সন্ধ্যে সাতটায় ভিক্টোরিয়া রঙ্গমঞ্চে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ভিক্টোরিয়া রঙ্গমঞ্চ নাম বদলে প্রথমে 'প্রমথনাথ টাউন হল', দ্বিতীয়বার 'অলোকা' এবং তৃতীয়বার 'স্মৃতি' হয়ে এখন ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তবে এখনও 'অলোকার মোড়' নামে স্থানটি বহুল পরিচিত।

১৮ ডিসেম্বর ভোরে কবি নাট্যকার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) ও কবি রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫১৯০১) বা স্তভিটা দেখতে যান। প্রথম যান রজনীকান্তের বাড়ি। *বাণী*, *কল্যাণী*, *অভয়া*, *অমৃত*, *আনন্দময়ী*, *বিশ্রাম*, *সদ্ভাবকুসুম* ও *শেষদান* প্রভৃতি রজনীকান্তের কাব্যগ্রন্থ। রজনীকান্তের বাড়ি ঘুরেফিরে দেখে কবি যান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র বাড়ি। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র তখন বয়স সত্তর ছুঁইছুঁই। তিনি *সমর সিংহ*, *সিরাজদ্দৌলা*, *সীতারাম রায়*, *মীর কাসিম*, *গৌড়লেখমালা*, *ফিরিঙ্গী বণিক* ও *অজ্ঞেয়বাদ* নাটক রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নাট্যকার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জরাজীর্ণ শরীরে কবিকে জড়িয়ে ধরে বলেন– 'আমরা অস্তমিত সূর্য, তুমি উদিত সূর্যের দীপ্তি নিয়ে এসেছ। আমি কল্পনা করিনি জীবনসায়াহ্নে এত কাছাকাছি তোমাকে দেখতে পাব।' সশ্রদ্ধচিত্তে কবি জবাব দেন– 'যিনি অভিশপ্ত ও কলঙ্কিত ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, যিনি সত্যকে সমাদৃত করতে পারেন তিনি মরতে পারেন না। দোয়া করন্নন আপনার চিন্তা ও চেতনাকে আমি যেন আমার কাব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারি।' অৰয়কুমার মৈত্রেয় কবিকে জলযোগে আপ্যায়ন করেন।

বিকেলে রাজশাহী টাউন হলে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মহেন্দ্রকুমার চৌধুরী। হাজার হাজার লোকের সমাগনে মহিলারা সংখ্যায় ছিলেন দু'হাজারের মত। কবি ভাষণ এবং সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সবার মন জয় করেন। রাত প্রায় ন'টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। সংবর্ধনার জবাবে পরদিন কবি বলেন– 'আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, আপনারা আমার সে বন্ধু হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজন। আপনাদের হৃদয়ে আমার জন্য এতো ভালোবাসা সঞ্চিত আছে, তা দূর থেকে বুঝতে পারা কঠিন। আপনারা আমাকে ভালোবাসার ফুল আর আনন্দের সওগাত দিয়ে অভিনন্দিত করলেন তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমি যেন দেশ ও দশের জন্য ভাই বোনদের জন্য রসসমৃদ্ধ কাব্য লিখতে পারি। ভরে তুলতে পারি সবার প্রাণ মন আনন্দ প্রীতিতে।' রাজশাহীর সাপ্তাহিক পত্রিকা *রাজশাহী বার্তার* সম্পাদক আব্দুস সামাদ কবিকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা পড়ে শোনান।

১৯২৯ সালের ৩১ জানুয়ারি কবি কলকাতা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেই সময়ে প্রায়শই স্কুলগুলোতে বার্ষিক অনুষ্ঠানে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হত। মিলাদ মাহফিলের জন্য দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রধান অতিথি করে আনা হত। অতিথি নির্বাচন ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের জন্য সম্মানের আর অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ব্যাপার। কবি এসেছিলেন ঠাকুরগাঁও হাই স্কুলের মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হয়ে। হাই স্কুলের ছাত্র সম্পাদক নাসিরউদ্দিন ও তার বন্ধু ইউসুফ কলকাতায় চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়নরত জসিমউদ্দিন আহমদের মাধ্যমে কবির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর ঠাকুরগাঁওয়ে আসা নিশ্চিত করে। কবির আসা নিশ্চিত হলে গোটা ঠাকুরগাঁওয়ে সাজসাজ রব পড়ে যায়। স্কুলমাঠে বিরাট সামিয়ানা টাঙিয়ে লোকজনের বসার ব্যবস্থা করা হয়। ঠাকুরগাঁও রেলস্টেশনে পৌঁছলে কবিকে স্বাগত জানানো হয়। এসময় ঠাকুরগাঁও হাই স্কুলের সভাপতি ছিলেন মহকুমা প্রশাসক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনিও কবিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। কবির সঙ্গে ঠাকুরগাঁও এসেছিলেন অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে পরিচিত জালালউদ্দিন হাশেমী। ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ন'টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। কবি প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন। পরে তিনি কালজয়ী 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে তরুণদের রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেন। আবৃত্তির পর মুহুর্মুহু করতালি আর অভিনন্দনসূচক 'বাহবা'ধ্বনিতে মুখর ঠাকুরগাঁওবাসী কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে জালালউদ্দিন হাশেমীও বক্তৃতা করেন। কবি রাতে স্কুলমাঠে নাটক উপভোগ করেন।

২ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও টাউন হলে কবির সম্মানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবি অনুষ্ঠানে উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে শোনান। ঠাকুরগাঁওয়ে তিনদিন অবস্থানকালে কবি বেশ কয়েকটি গানের আসরে গান গেয়ে শোনান। কবি কংগ্রেস কমিটির সভাতেও যোগদান করেন। কবিকে অনেক বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং রায়সাহেব গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, কেরামত আলী মোক্তার, উকিল সতীশ ঘোষ প্রমুখের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। ঠাকুরগাঁও হাই স্কুলের দেয়াল পত্রিকার জন্য কবি 'যৌবন' নামে একটি কবিতা লিখে দেন। ৩ ফেব্রুয়ারি কবি কলকাতার উদ্দেশে ঠাকুরগাঁও ত্যাগ করেন।

একই বছরে কবি বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনে যোগ দিতে বগুড়া আসেন। তারিখ মাস সঠিকভাবে জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী কে এম শমসের আলী তাঁর প্রবন্ধে ১৯২৯ সালটা উলেখ করলেও তারিখ মাস দিন উলেখ করেননি। তবে মুজাফ্ফর আহমদ প্রথম নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হয় বলে উলেস্নখ করেন। দ্বিতীয় সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কৃষ্ণনগর ১৯২৬এর ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি। এ তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যেহেতু উলেখিত দু'টি সম্মিলন ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে, ১৯২৯ সালের সম্মিলনটিও সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ক্রমানুসারে সম্মিলনটি সম্ভবত ছিল পঞ্চম। যাই হোক, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কবি বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলন উপলক্ষ্যে বগুড়ায় এসেছিলেন একথা সত্য।

কবি কলকাতা থেকে ট্রেনে বগুড়া স্টেশনে পৌঁছলে কে এম শমসের আলীর নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনতা কবিকে স্বাগত জানায়। স্টেশন থেকে কবিকে মিউনিসিপাল স্কুলে নিয়ে আসা হয়। এখানে কবির থাকারও ব্যবস্থা করা হয়। বিকেলে এডওয়ার্ড পার্কের সম্মিলনীতে কবি 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'সহ বেশ ক'টি গান পরিবেশন করেন। সম্মিলনে কবির বাজেয়াপ্ত কাব্যগ্রন্থ *ভাঙ্গার গান* ও *বিষের বাঁশী*সহ অন্যান্য বই বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পরে উডবার্ন লাইব্রেরির কর্মকর্তারা কবিকে স্বাগত জানান। সবার অনুরোধে কবি 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী', 'নারী' ও 'কুলি মজুর' কবিতা আবৃত্তি করেন। ডা. মফিজউদ্দিনের বাসায় চাচ ক্রে

কবি নজরুলের প্রতি মুসলমান-সমাজের একাংশ অহেতুক নাখোশ ছিল। তারা নজরুলের সাহিত্যকর্মের বিরোধিতা করত এবং অশালীন কথাবার্তা বলত। এ ধরনের লোকদের প্রতি ক্ষুব্ধ তরুণসমাজ বা নজরুলভক্তরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন ও তাঁর প্রতি বিদ্বেষের সমুচিত জবাব দিতে সিরাজগঞ্জের মুসলিম তরুণ সংঘের ব্যানারে কবিকে সিরাজগঞ্জে এনে সংবর্ধনাদানের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের বিশ্বাস, নজরুল নিন্দুকদের ভুল ভেঙে দেবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য তারা অভ্যর্থনা কমিটি, কনফারেন্স বাস্তবায়ন কমিটি, অতিথি আপ্যায়ন কমিটি, অর্থ সংগ্রহ উপ-কমিটি, শান্তি-শৃঙ্খলা উপ-কমিটিসহ বিবিধ উপ-কমিটি গঠন করে।

যোগদান শেষে কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯২৯ সালের ১৬ মার্চ কবি জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুরে আসেন আক্কেলপুর ইয়ংম্যান্স মুসলিম এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সম্মিলনে যোগদান উপলক্ষ্যে। কবি কুষ্টিয়া থেকে আক্কেলপুর আসেন। আক্কেলপুর রেল স্টেশনে পৌঁছলে শোভাযাত্রাসহ কবিকে নদীতীরবর্তী হাটের দক্ষিণে বিরাট মাঠে সম্মিলন স্থলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মনসুরউদ্দিনের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে বেলা একটায় সম্মিলন শুরু হয়। কবিকে সংবর্ধনা জানিয়ে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও তরুণ কবি সৈয়দ আফতাব হোসেন বক্তব্য রাখেন। এসোসিয়েশনের সম্পাদক মো. আকবর আলী বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। সৈয়দ আফতাব হোসেন কবির উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা 'প্রীতি সওগাত' পাঠ করে শোনান এবং কবিতাটি কবির হাতে তুলে দেন। প্রায় তিন হাজার দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে কবি সংস্কার সম্পর্কে তেজস্বী বক্তব্য রাখেন এবং গজল গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। মাগরিবের পর আকবর আলীর বাড়িতে প্রায় তিনশো লোকের উপস্থিতিতে দু'ঘণ্টা ধরে চলে গজল গানের জলসা। কবি তাঁর গজল কারিশমায় উপস্থিত শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলেন। মহাবীরপ্রসাদ আগরওয়ালের বাড়িতে কবি রাত্রিযাপন ক রেন। কবি যে ঘরটিতে অবস্থান করেছিলেন সেটি বর্তমানে টেলিফোন অফিস।

কবি নজরুলের প্রতি মুসলমানসমা জের একাংশ অহেতুক নাখোশ ছিল। তারা নজরুলের সাহিত্যকর্মের বিরোধিতা করত এবং অশালীন কথাবার্তা বলত। এ ধরনের লোকদের প্রতি ক্ষুব্ধ তরুণসমাজ বা নজরুলভক্তরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন ও তাঁর প্রতি বিদ্বেষের সমুচিত জবাব দিতে সিরাজগঞ্জের মুসলিম তরুণ সংঘের ব্যানারে কবিকে সিরাজগঞ্জে এনে সংবর্ধনাদানের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের বিশ্বাস, নজরুল নিন্দুকদের ভুল ভেঙে দেবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য তারা অভ্যর্থনা কমিটি, কনফারেন্স বাস্তবায়ন কমিটি, অতিথি আপ্যায়ন কমিটি, অর্থ সংগ্রহ উপকমিটি, শান্তিশৃঙ্খলা উপকমিটিসহ বিবিধ উপকমিটি গঠন ক রে। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হন কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর পুত্র সৈয়দ আসাদউলাহ সিরাজী, সহ-সভাপতি হন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ডা. ময়েজউদ্দিন, সম্পাদক হন এম সেরাজুল হক। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনির কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডার মনোনীত হন যথাক্রমে আজিজুল ইসলাম চৌধুরী ও ইজাবউদ্দিন আহমদ। ১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বর কনফারেন্সের তারিখ নির্ধারিত হয়। তারিখ উলেখ করে কবি নজরুলের সম্মতি পাবার জন্য কনফারেন্স কমিটির পক্ষ থেকে দু'দুটি চিঠি দেওয়া হয়। কবি দুটি চিঠিই পান এবং আমন্ত্রণ গ্রহণের সম্মতি জানিয়ে দুটি চিঠিরই উত্তর দেন। উত্তর পাওয়ার পর আসাদউলাহ সিরাজী কলকাতা গিয়ে চূড়ান্তভাবে কবি নজরুল, আব্বাসউদ্দিন আহমদ এবং রাজনৈতিক নেতাদের দাওয়াত করেন।

৫ নভেম্বর সকালে কবি সিরাজগঞ্জ রেল স্টেশনে এসে পৌঁছেন। কবির সঙ্গী ছিলেন আব্বাসউদ্দিন আহমদ, নজরুলঅনুরাগী সুফি জুলফিকার হায়দার ও ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য গিয়াস উদ্দিন আহমদ। রেল স্টেশনে হাজার হাজার মানুষ প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে কবি ও তাঁর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানায়। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিবিধ শোগানে দশদিক মুখরিত করে তোলে। 'কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে স্টেশনের আকাশবাতা স গম্‌গম্‌ করতে থাকে। ট্রেন থেকে নামলে কবিকে মাল্যভূষিত করা হয়। তরুণ ছাত্ররা কদমবুচি করে। বয়স্করা করমর্দন ও কোলাকুলি করে। কবি টুপি শেরোয়ানী পায়জামা ও উত্তরীয়য় সজ্জিত ছিলেন। সব পোশাকই ছিল খদ্দরের।

ঘোড়ার গাড়িতে বিশাল শোভাযাত্রাসহ নগর পরিভ্রমণ শেষে কবি ও কবির সঙ্গীদের অভ্যর্থনা কমিটির অন্যতম সদস্য মোক্তার আফজাল আলী খানের যমুনা তীরস্থ বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই কবির থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কবির সঙ্গীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় যমুনাতীরবর্তী ডাকবাংলোয়।

সকাল ও দুপুরের খাওয়া শেষে একটু বিশ্রামের পর কবিকে মুসলিম তরুণ সংঘ আয়োজিত সম্মিলন স্থল নাট্যভবনে (বর্তমান পৌরভবন) নেওয়া হয়। এখানে কবিকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। বেলা একটায় অনুষ্ঠান শুরু হয় কবির লেখা 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে' উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। সংগীত পরিবেশন করেন আব্বাসউদ্দিন আহমদ। কবি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বিশাল জনসমুদ্রে কবি যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, তা ছিল কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিভাষণ। এ অভিভাষণে সমগ্র মানব জীবনের আদর্শ, তারুণ্যের আদর্শ সম্পর্কিত চেতনাবোধ, ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে কঠোর ও গঠনমূলক বক্তব্য ছিল। অভিভাষণ শেষ হলে মুহুর্মুহু করতালিতে নাট্যভবন মুখরিত হয়ে ওঠে। জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহউ দ্দীপনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে সুফি জুলফিকার হায়দার, সেরাজুল হক, আসাদউলাহ সিরাজী, গিয়াসউদ্দিন, সৈয়দ আকবর আলী, ইজ্জত আলী পেশকার ও আফজাল মোক্তার বক্তৃতা করেন। কবি সবার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দ্বিতীয় দিনে কবি 'নারী' কবিতা আবৃত্তি এবং সংগীত পরিবেশন করেন। আব্বাসউদ্দিন আহমদও সংগীত পরিবেশন করেন। সিরাজগঞ্জে দু'দিনের অবস্থানে কবিকে নিয়ে সারাশহর মেতে ওঠে। নাট্যভবনে কবি নজরুল এবং আব্বাসউদ্দিনের সান্নিধ্য পাবার জন্য জনগণের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়, তা নিয়ন্ত্রণ করতে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনিকে হিমসিম খেতে হয়। কবির সৌজন্যে কর্তৃপক্ষ দু'দিন সিরাজগঞ্জের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। আফজাল মোক্তারের বাড়িতে সংবর্ধনা-ভোজে কবি অংশগ্রহণ করেন। পরে কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বাড়ি 'বাণীকুঞ্জে' যান। সেখানে কবি সিরাজীর মাজার জিয়ারত করেন এবং বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, '*অনল প্রবাহের* কবি আমাকে যে আদর দিয়েছিলেন তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। এমন আদর সারা বাংলায় আমি আর কারো কাছ থেকে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।' তৃতীয় দিন সকালে কবি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে সিরাজগঞ্জ ত্যাগ করেন।

পূর্ব বাংলায় বিশেষত বরেন্দ্র অঞ্চলে কবির আগমনকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহউ দ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা অভূতপূর্ব হলেও অভাবিত ছিল না। তাঁর কাছ থেকে এতদ্বঞ্চলের মানুষ যেমন পায় জীবন গড়ার বাণী, তেমনি কবি লাভ করেন মানুষের আকুণ্ঠ ভালবাসা এবং অতুলনীয় সংবর্ধনা। বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষের মনে কবির স্মৃতি চির অমলিন হয়ে থাকবে।

মুকুল কেশরী সম্পাদক, অক্ষর

বিহ্বল

নীহার মোশারফ

ছলছলে নদীপথ... এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূরে
যেখানে সবল সরলতায় খোলা থাকে চোখ
আলোকিত পথের ধনুক ধরে, কে যেন হাঁটে
কাঁচা রং ছোঁয়
অথচ ভেতরে দগদগে যন্ত্রণা; জমাট অন্ধকার
মাথার রক্ত পায়ে চলকায়
হামাগুড়ি খায় অব্যক্ত ভাষা
তবুও চন্দ্রাচ্ছন্ন বিহ্বলতাটুকু তাড়িয়ে বেড়ায় সে
কী যেন খোঁজে; কত রাত কেটেছে নিঃশব্দে।

আলোর ভেতর রয়ে গেছে বিরহ রহস্য।
বুঝতে দেয়নি
স্বপ্নভূমি এভাবেই উর্বর হয়েছে তার।
ঝরে গেছে পুরোনো ইচ্ছে
সভ্যতা জেগেছে সরোবরে
নাভিতে লেগেছে ওম
ঘাতককাঁটা পরিণত হয়েছে মুদ্রায়
শব্দেরা তখন হইচইয়ে মত্ত
কবির জলসাঘরে নর্তকীর পা
ঝুমুর ঝুমুর নাচ
শরাবের গ্লাসে ছবি ভাসে কার?
সেও কী নগ্ন নারী;
নাকি গল্পের পাণ্ডুলিপি?
যখন চক্রাকার পথে কলম
ভিড় করে কবিতার লাইন
অমোঘ প্রেম, উড়োচিঠি
মোহিনী উসকে দিচ্ছিল বাতাস
রূপ বিপণির শার্সিতে
এমন বসন্তে হয়তো সে এসেছিল
কৃষ্ণচূড়ার রঙের রাঙাতে দু'হাত

ফাঁদ

জ্যোতির্ময় মল্লিক

আকাশে বিলয়মান একাদশীর চাঁদ
মনুষ্যশ্বাপদের নির্ভয় বিচরণ
ঘুমন্ত শহর এখন মরণফাঁদ
সহসা আর্তরবে ঘটে রক্তক্ষরণ।

মহাসঙ্গম

ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম

পাষাণের গায় বাষ্পমথিত জলকণা তুমি হায়
তপ্তত্ষিত মরু শিকারিরা লোহিত জিভ বাড়ায়
বুক্কলু ব্ধ ঝঞ্ঝার হুঙ্কারে
ছিন্নভিন্ন, লতাকুঞ্জের ধারে
বিপন্ন ভীতা জলকণা তুমি কাঁদো।
বিরাগ্নবিথার বিষণ্ন পথরেখা
জলকণা তুমি ভাবো কি নিজেকে একা
তাই কি বিজনে বিলাপের বীণা বাঁধো?
ওগো জলকণা, প্রাঞ্জল জলকণা
কে বলেছে তুমি হতবঞ্চিত মৃত্যুপ্রহরগোনা?
কে বলেছে তুমি বিলয়বিন্দু
কে বলেছে তুমি একা–
তোমাদের সাথে হয়নি তবে কি
মহাজলধির দেখা?

তোমার হৃদয়ে অসীমের ডাক সিন্ধুর আহ্বান
প্রেমিক পান্থ গাও মিলনের গান।
জলকণা তুমি আপন আবেগে দিকে দিকে প্রেম বিলাও
চারপাশে সব বিন্দুতে বুক মিলাও
চারদিকে তোলো নির্ঝর কলতান
জলকণা তুমি গাও মিলনের গান।

জলকণা জেনো
তোমার মিলনে অঙ্কিত হবে পথ
ভেসে যাবে সব স্থাণুজ ঙ্গম।
অধীর আবেগে ধেয়ে যাবে স্রোতরথ
সীম্নঅসী মের হবে মহাসঙ্গম।

ভালবাসার গান

শুক্লা সান্যাল

চল না, আমাদের দুঃখগুলো
ডোঙায় ভরে ভাসিয়ে দিই
সময়ের স্রোতে।

বাঁশের বাঁশিটি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি
মেঠোপথ ধরে
হারাই নিরুদ্দেশের পথে।

সাঁঝতারা উঠবে যখন জোনাকির আলো
গায়ে মেখে ফিরব...
মর্মরিত বনানী শোনাবে ভালবাসার গান।

শুক্লা সান্যাল ভারতের কবি

একটি দীর্ঘ কবিতার সন্ধানে

সোহেল অমিতাভ

সিগারেট ফুঁকছিল আর দেখছিল
চড়ুইটি ঢুকছিল আর ফুড়ুৎ করে বের হচ্ছিল।
ধানের গোলায় নিরাপত্তা বেষ্টনীর ফুটো দিয়ে
একটি চড়ুই ঢুকছিল
আর ফুড়ুৎ করে বের হচ্ছিল।
দীর্ঘ কবিতা লিখবার আশায়
দীর্ঘকায় বেকুব এক কবি

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এক সময়
আলফা টোবাকো শেষ হয়ে গেল!
চড়ুইটা তখনো ঢুকছিল
আর ফুড়ুৎ করে বের হচ্ছিল।
ধূমপানহীন কবি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে
সেটাই দেখছিল
চড়ুইটা ফুড়ুৎ করে ঢুকে
ফুড়ুৎ করে বের হচ্ছিল!
অঘ্রাণের পড়ন্ত দুপুরে
কবি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল
চড়ুইটা ফুড়ুৎ করে ঢুকে
ফুড়ুৎ করে বের হচ্ছিল।
এইভাবে চল্লিশ বছর কেটে গেল
আরব্য রজনীর বাগদাদী চল্লিশ চোর
একদিন সাদ্দামকেও হত্যা করল!

চড়ুইটা ফুড়ুৎ করে ঢুকে ফুড়ুৎ করে
বের হয়ে গেল।
অতঃপর কসাই কাদেরের ফাঁসিও হল
চড়ুইটা ফুড়ুৎ করে ঢুকে ফুড়ুৎ করে
বের হয়ে গেল।
একটা উড়োজাহাজ উড়ে গেল
দিগন্ত পেরিয়ে সূর্যাস্তের দৰিণ্ণপশ্চিমে
চড়ুইটা কিছুক্ষণ ঢুকতে গিয়ে ফিরে গেল
কিন্তু আবার ফুড়ুৎ করে ঢুকে
ফুড়ুৎ করে বের হল।

ইনডেমনিটির খসড়া কাগজের ঠোঙায়
চলনবিলে মদন কটকটি বিক্রি হচ্ছিল
কর্নেল তাহেরের ফাঁসিও হয়েছিল
তখনো চড়ুইটা ঢুকছিল আর বের হচ্ছিল!
এরশাদের অবৈধ আর বৈধ
বিবাহের সাহিত্যবাসরে
যে কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল
সেগুলো দৈর্ঘ্যে দীর্ঘ ছিল না।
চড়ুইটা কিন্তু তখনো ঢুকছিল
আর ফুড়ুৎ করে বের হচ্ছিল।

প্রিয় ছেলেবেলা

জাহিদ মুস্তাফা

প্রিয় ছেলেবেলা–
বেহুলা জননী এই বঙ্গদেশে ফিরে যা আবার
শ্রাবণ্ণধারার বেগে ছেলেবেলা ছুটে ছুটে আয়
মায়ের মমতা হয়ে আয় দেখি আরেকটিবার
জোছনা বিছানো পথে জনক লখিন্দর
কাকে যেন ডাকে– বাছা, আয় বাপধন,
বাবার আদর হয়ে ফিরে আয় বেটা,
ন্যাটা মেরে দু'দ- বসে যা নিকোনো উঠোনে
মায়ের উনুন ঘরে পিঁড়ি পেতে বসে
পাটালিগুড়ের মিষ্টিপায়েস আয়েশ করে খেয়ে যা শৈশব।

মুক্তিযুদ্ধ জয় করে বেথিলার মোড়ে উদ্বাহু
বটের ছায়ার মত ছেলেবেলা সাথে করে
ফিরে আয় ভাই
ফিরে আয় মায়াময় দু'চোখে কাজলমাখা বোন
মিয়াভাই, কি আনছ আমার জন্য করটিয়া থিকা!

ফিরে আয় বিন্দুবাসিনী মাঠ, ছেলেবেলা খেলার সাথীরা
ছোটকালীবাড়ি ঘিরে বৈশাখী মেলার হুল্লোড়
ফিরে আয় নদীমেখলা বর্ষার নাও
একদার প্রমত্তা ঝিনাই
ফিরে আয় কাশিল্লকা ঞ্চনপুব্রজশিহাট্টিবিল বাসাই লে
বৃষ্টির অঝোর ধারা, তুমুল বর্ষার গাঙ ভূবনমোহিনী
ফিরে আয় কাগজের নৌকাভাসা– প্রিয় ছেলেবেলা।

নন্দন

গৌতমকুমার দে

নন্দন চত্বরে ঢুকে সোনালী বিকেলে
দেখছি কত পুরুষ বসে আছে নারীসঙ্গে,
যুবক্কযুবতী আ ছে, বয়স্ক আছে
কেউ কেউ গান গাইছে গিটার সহযোগে
এখানে এসে বয়সটা হঠাৎ থমকে যায়
রক্তস্রোত ওপর নীচ করে না,
স্থাণু চোখের দৃষ্টি, কাকটাস অরণ্যে হারায়।
সভ্যতা এখানে বসে আছে,
জীবন এখানে লাস্যময়
যৌবন এখানে কল্লোলিত উচ্ছ্বাস।

এখানে আমার হেঁটে যাওয়া মানায় না।

গৌতমকুমার দে ভারতের কবি

প্রবন্ধ

প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

মো. রেফুল করিম

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের পূজারী। এ সুন্দর অন্তর-ঐশ্বর্যের। মন-ঐশ্বর্যের এই সৌন্দর্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়, মিশে যায়। মানবজীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে আলো বাতাস জল পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদির ওপর। প্রাচুর্যের সঙ্গে যে স্নেহ-সম্ভার প্রকৃতি অকৃপণ হাতে আমাদের দান করেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধেও আমরা তাকে স্মরণ করি না। রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে এরই জন্য বড় ব্যথা অনুভব করেছিলেন। বহু লেখায় তাঁর ব্যথিতমনের এই অভিযোগ ফুটে উঠেছিল। আমাদের প্রতিদিনের একান্ত সঙ্গী দিনের সূর্য, চাঁদের আলো জল মাটি প্রভৃতির মধ্যে যে বিশ্ব-প্রকৃতি জাগ্রত রবীন্দ্রনাথ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। নানা অপূর্ণতায় নানা সংক্ষোভে উপবাসে তৃষ্ণায় অতৃপ্তিতে আমাদের জীবন কেটে যায়। সেই অপূর্ণ অতৃপ্তির শূন্যতার মাঝে এক অনুচ্চারিত হাহা ঘুরে বেড়ায় আমাদের অন্তর্লোকে। সেই কষ্টের বেদনার থেকে পরিত্রাণ আমাদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত– রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতির উপস্থিতি। প্রকৃতি যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে উপস্থিত থেকে আমাদের উপবাসী অন্তরের অন্ন হয়ে আসে, আমাদের তৃষ্ণাতুর প্রাণের তৃষ্ণার জল হয়ে দেখা দেয়, আমাদের সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের শুশ্রূষা হয়ে আসে, শান্তি হয়ে আসে। সেই রবীন্দ্রগান পরম গান শিল্পের চরম সংবেদনার শীর্ষবিন্দু। রবীন্দ্রগানে প্রকৃতি পরমাপ্রকৃতি হয়ে ধরা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের সিংহভাগ অধিকার করে আছে প্রকৃতি। প্রকৃতি তার অমোঘ অনতিক্রম্য অব্যর্থ ভূমিকাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজন-ভুবনে সমুপস্থিত। তাই তিনি গানের মধ্য দিয়ে বলেছেন: 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভূবনখানি, তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি'।

এতে অনুমান করা যায় যে কত নিবিড়ভাবে তিনি প্রকৃতির দরদীমনের আহ্বানে নিজেকে একান্তভাবে প্রকৃতির কোলে সমর্পণ করেছেন। প্রকৃতি যেমন উদারভাবে যাবতীয় সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে, কবি তেমনি বাঁধনহারা খুশিমত প্রকৃতির গানে সুর যোজনা করতে দ্বিধা বোধ করেছেন। প্রকৃতি তার যা কিছু ভাষা সব উজাড় করে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়েছেন। আমাদের সমস্ত ঋতুস ম্পর্কিত অনুভব ও উপলব্ধি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গ ও স্মৃতিতে ভরা– একথা অস্বীকার করবে কে? গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত পর্যন্ত ছয়টি ঋতুর যে বৈচিত্র্য বিস্তার তার অনুপুঙ্খ সংবেদনা কে শেখাল আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া? স্পর্শকাতর বাংলার অপরূপ ঋতুকে কেন্দ্র করে কত অপরূপ গানই না বিস্তারিত হয়েছে *গীতবিতানের* পাতায় পাতায়। রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতানের* ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে প্রকৃতি পর্যায় একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রকৃতি পর্যায়ে অসংখ্য গান আছে। প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে বিভিন্ন ঋতু ছাড়াও আকাশ বাতাস জল নদী পাহাড় আমাদের প্রকৃতির সকল অংশই সন্নিবেশিত রয়েছে। বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে নানান উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। আজও শান্তিনিকেতনে নানা উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রধান হল বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপণ, হল কর্ষণ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, পৌষ উৎসব, মাঘোৎসব ইত্যাদি। প্রকৃতি প্রসঙ্গে কবি বলেছেন– 'প্রকৃতির মধ্যেও দেখি, ঋতুতে ঋতুতে নতুন নতুন উৎসব। প্রত্যেক ঋতু তার নিজের অর্থ বহন করে আনে, শরৎ যখন তার শিশিরধৌত নির্মল সৌন্দর্যের প্রাচুর্য নিয়ে দেখা দেয় তখন সে আমাদের আত্মাকে আহ্বান করে, তখন আমাদের একটি বিশেষ কল্পনার দিন উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে তখন আমরা শুনতে পাই এক অখ- সুষমার বাণী।' রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি হচ্ছে দেবী– মানবী। তাই তিনি প্রকৃতিগত প্রাণ।

এসো এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥

কবি রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মে বৈশাখকে আহ্বান করে উপরোক্ত গানটি লিখেছিলেন। কবি প্রতিটি ঋতুর আবির্ভাবকে সজ্ঞানে অভিনন্দন জানিয়েছেন, জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্বন্ধ বন্ধন ঘটিয়েছেন। প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন। 'মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনা দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজানিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়। তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।' প্রকৃতির সঙ্গে এই নন্দিত মিলনসাধনের পালাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। কবি গ্রীষ্ম ঋতুকে নিয়ে ১৬টি গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে আছে–

আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির এই উপস্থাপন দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সেই বিস্ময়ে কবি গান রচনা করেছেন। আবার গ্রীষ্মের প্রখর রুদ্রতার মাঝে লিখেছেন–

নাই রস নাই, দারুণ দাহন বেলা,
খেল খেল তব নীরব ভৈরব খেলা ॥

তিনি বৈশাখে ভয়ঙ্কর কালবোশেখী নিয়ে লিখেছেন–

ওই বুঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যাআকাশ দেয় ঢাকি ॥
ভয় কীরে তোর ভয় কারে
দ্বার খুলে দিস চারধারে–

বৈশাখকে তিনি ধ্যানমগ্ন ঋষির কঠোর রূপ হিসেবে কল্পনা করেছেন– যেখানে বৈশাখ দৃঢ়, নিশ্চল, নিশ্চুপ।

এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা,
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে॥

কবি গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণনায় রুদ্ররসের ভিতর দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন চিরস্নিগ্ধ বর্ষা ঋতুকে। দুঃখতা পে ক্লান্ত তপস্বিনী ধরণীর ক্লান্তি দূর করবার জন্য বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব হয়েছে। শুষ্ক ধরণী সুশোভিত হয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এই বর্ষা ঋতুকে কবি গৃহী, সংসারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ বর্ষা আমাদের মনকে একস্থানে আবদ্ধ করে রাখে, বৃষ্টির জল চারিদিকে ঘিরে থাকে এবং মেঘ যেন আমাদের মাথার ওপর চাঁদোয়ার মত আচ্ছাদান হিসেবে অবস্থান করে। প্রিয় বর্ষা ঋতুর জন্য রবীন্দ্রনাথ ১১৫টি গান রচনা করেছেন যা ঋতুকালীন গানের মধ্যে সর্বাধিক।

বর্ষা ঋতুতে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে কিছু উৎসব পালিত হয়ে থাকে। উৎসবগুলি হল– বৃক্ষরোপণ, হল কর্ষণ, বর্ষামঙ্গল। বৃক্ষরোপণ করা অর্থাৎ গাছ লাগানো আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বৃক্ষরোপণের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বৃক্ষরোপণ উৎসব উদ্‌যাপন করতেন। এই বৃক্ষরোপণে উৎসবচিত্ত দেখা যায় প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গাছ। গাছপালা ছাড়া পরিবেশ সম্পূর্ণ হতে পারে না। বৃক্ষরোপণ এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শান্তিনিকেতনে প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ গানও রচনা করেছেন– 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও'। বৃক্ষরোপণের সময় এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। বৃক্ষলালনে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল অসীম এবং বৃক্ষরোপণ তাঁর কাছে ছিল ধর্মাচরণের মতই পবিত্র এক উৎসব। এই উৎসবের মূলে আছে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। অতএব বৃক্ষরোপণ পরিবেশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একটি কর্তব্য।

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের
পানে।

রবীন্দ্রনাথের গান। প্রকৃতি ও পরিবেশের সবচেয়ে বড় বিস্ময় হচ্ছে এই মানুষ। আর এই পরিবেশের মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন খাদ্য ও শস্যের। প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্যতম প্রধান উপাদান হল এই ভূমি বা মাটি। জীবনধারণের জন্য আমরা এই মাটির মধ্যে অনেক ধরনের শস্যের চাষ করে থাকি। মাটির মধ্যে ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজন হল কর্ষণের। তাই শ্রীনিকেতনে হল কর্ষণ একটি প্রধান উৎসব। পৃথিবী ও কৃষির মৌল উৎসবকলার মধ্যে হল কর্ষণ প্রধান। কবি বলেছেন, হল কর্ষণ আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য, আমাদের নিজের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ সেজন্য শ্রীনিকেতনে কৃষিকেই প্রধান্য দিয়েছেন। কৃষিচেতনার সূত্রেই হল কর্ষণ উৎসবের প্রবর্তনা। সুতরাং এই পরিবেশে বেঁচে থাকতে গেলে প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে আমাদের খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হবে। আর তার প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে হল কর্ষণ।

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ৰিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা ॥

বর্ষায় কবির মনে যে বিচিত্র ভাবের পস্নাবন আসে তাকে ভাষা দিয়েছেন শতাধিক গানে ও কবিতায়। বর্ষায় কবির বর্ষামঙ্গলের আয়োজন বড় মধুর। বর্ষার আহ্বান, বর্ষার রূপবর্ণনা, শ্রাবণ বর্ষণ, বর্ষাবিদায় ও শরতের আগমনী গেয়ে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান। বর্ষামঙ্গল ছাড়াও বর্ষার আরো সুন্দর আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন, যথা শ্রাবণ গাঁথা ও শেষবর্ষণ। মূলত বর্ষার আগমন সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসবের সূচনা করেছিলেন।

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি
শেফালি মালা
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি
ডালা।

বর্ষার পরে আসে শরৎ। এই ঋতুকে তিনি নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই ঋতুকে তিনি ছুটির ঋতু রূপেও বর্ণনা করেছেন। কারণ কোন কিছুতে যেন কোন আসক্তি নেই। জলশূন্য মেঘ আকাশের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিনা প্রয়োজনেই ঘুরে বেড়ায়। শিউলি ফুল ফোটার কোন আসক্তি তিনি দেখেন না। যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে, সব কিছুর মধ্যেই যেন অনাসক্ত ভাব বিদ্যমান। এই শরৎ ঋতুর আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসব সৃষ্টি করেছেন। ঋতুর দিক থেকে শরৎকে কবি স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছেন। শারদোৎসব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পত্রাবলীতে লিখেছেন: 'আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হয়েছে

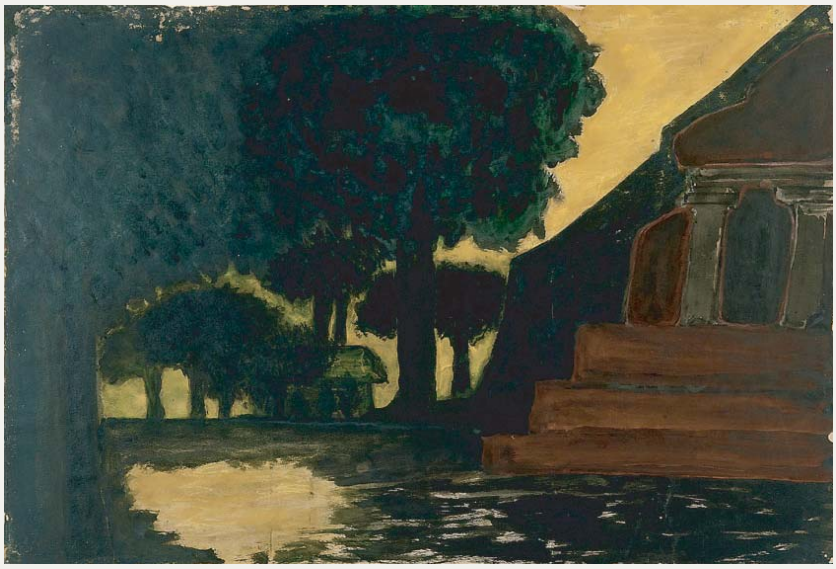

শিউলিবনে সাড়া দিয়েছে; মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্র ফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাত্রের চাঁদের আলোয় আকাশজোড়া একখানি শুভ্রতা। আমাদের লাল রাস্তার দুইধারে কাশের গুচ্ছ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে, বাতাসে মাথা নত করে পথিকদের শারদসঙ্গীত শুনিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত সবুজ মাঠে সমস্ত শিশিরসিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ হিলোল বয়ে যাচ্ছে।'

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।

হেমন্ত ঋতুকে কবি ধরিত্রীর রিক্ত অবসাদের রূপ কল্পনা করেছেন। তার যা কিছু সম্পদ ছিল সব শস্যরূপে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে আমাদের। এই ঋতুকে অবলম্বন করে তিনি পাঁচটি গান রচনা করেছেন। হেমন্তের গানগুলোতে গভীর অনুভূতির আনন্দ যেমন মানুষকে সুখদুঃ খের মিলন-বির হের জন্ম-মৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে, তেমনি প্রকৃতিও গভীর সত্তায় পরিব্যাপ্ত চৈতন্যউ দ্বোধিত প্রাণের নব সব প্রকাশে জয়-পরাজয়ের বাণী নিত্য নিয়ত ঘোষণা করেছে। কবি তাঁর গানে, কখনওবা কবিতায় আপন হাতের মাধুরী মিশিয়ে হেমন্তর নবান্ন, মাঠ ভরা সোনালী ধান, কৃষাণক্ষাণীর নবান্নের ব্যস্ততা অত্যন্ত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
আয়, আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।

হেমন্তের পরে আসে শীত। শীতকালে ফসল কাটার সময়– আবার তা খোদাই কাজের পক্ষেও প্রশস্ত। একদিকে নবান্নের পরিপূর্ণ আহ্বান, আরেকদিকে ধ্বজা পূজার মদিরা পিচ্ছিল বীভৎসতা, একদিকে মাটির তলাকার মৃত সোনা, আরেকদিকে সোনার রঙের ফসল। প্রকৃতির ঋতুচক্র অনুসারে পৌষমাসে অনুষ্ঠিত হয় পৌষ মেলা। ঋতু পরিবর্তনে জগতের শোভা ও সৌন্দর্যের পালাবদল ঘটে। এই পালাবদলের পথ বেয়েই আসে মানুষের অনুভূতি ও ভাবনায় বৈচিত্র্য। প্রত্যেক মানুষের অনুভূতির সমষ্টির চেতনাসূত্রই সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ *রক্তকরবী* নাটকের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন ফসল কাটার গান। উপসংহারে পৌষের গান দিয়ে কবিনাট্যকার নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। পৌষের পাকা ফসল মানুষকে যেন যান্ত্রিক পীড়ন ও নিষ্ঠুর সঞ্চয়ের হাত থেকে মুক্তি এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সেজন্যে বাসনার নির্বাণের মধ্যে তিনি ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি খুঁজেছেন। পৌষ উৎসব ফসলের উৎসব, চয়নের উৎসব। পৌষ উৎসব কৃষকের কঠোর শ্রমজাত ফসল আহরণের আনন্দোৎসব। অতএব পৌষ উৎসবের একটি দিক পরিবেশের ও প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। পৌষ উৎসবের মূল লক্ষ্য হল নতুন ফসল ঘরে তোলা যা প্রকৃতিরই দান। সুতরাং যে পরিবেশে ফসল ও শস্য উৎপাদিত হয় এবং এই ফসল ও শস্য সংগ্রহের যে আনন্দ তাকে কেন্দ্র করেই এই পৌষ উৎসব।

শীত স্বভাবতই বসন্তের দৌবারিক। 'এসেছ শীত গাহিতে গীত বসন্তেই জয়।' শীতের গানগুলির মধ্যে তাই যৌবনের প্রত্যাশা, বসন্তের ছদ্মবেশ। 'শীত' কবিতায় শীতের প্রতি কবির যে সম্বোধন–

ওগো শীত, ওগো শুভ্র; হে তীব্র নির্মম
তোমার উত্তর বায়ু দুরন্ত দুর্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে।

শীতের গানে বৈচিত্র্য নেই, কারণ শীতের তত্ত্ব একটাই– সে তত্ত্ব ফাল্গুনী নাটকে, সে তত্ত্ব নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়, সে তত্ত্ব গানের ভাষাতেও আছে। রবীন্দ্রনাথ শীত ঋতুকে শুষ্ক আসনে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক গানে বসন্তকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়ে প্রকৃতিকে অর্থাৎ বিশ্বকে আপন করে নিয়েছেন। কবি প্রথম জীবন থেকেই বসন্তের প্রতি তাঁর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন।

'বসন্ত উদাসীন গৃহত্যাগী। বসন্ত আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হয়ে যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে থাকে, ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে... বসন্তে বহির্জগৎ গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করে আমাদের মনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়।'

কবিগুরু বসন্ত ঋতুকে নিয়ে প্রচুর গান নাটক ও কবিতা রচনা করেছেন। গীতবিতানে বসন্তের গানের সংখ্যা ৯৬টি– তার মধ্যে অধিকাংশ গানই *রাজা, অরূপরতন, শাপমোচন, ফাল্গুনী, বসন্ত, নটরাজ পালা* ও *নবীনের গান*এ অন্তর্ভুক্ত। বসন্ত পর্যায়ের বাইরে অন্যান্য পর্যায়ে বসন্তপ্র সঙ্গের গীতসংখ্যাও প্রভূত। বসন্তের নৈসর্গিক শোভার পটে প্রেমের যেমন পরিণাম, তেমন আর কোন ঋতুতে নয়। তাই প্রেম পর্যায়ের অসংখ্য গানেও বসন্তের পশ্চাদ্‌ভূমি খুঁজে পাই আমরা, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি সেখানে বসন্তকে। যে সুন্দরকে কবি বরণ করতে চান সে সুন্দর ফাল্গুন হয়েই কবির পরাণের পাশে আসে, সুধারসধারে অঞ্জলি ভরে দেয়।

ওরে গৃহবাসী খোল্ দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্ ॥

প্রকৃতির মধ্যে যে বসন্ত ঋতু সেই ঋতুকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব অর্থাৎ বসন্তোৎসব পালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ বিভিন্ন আবীরে মেতে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বসন্ত প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব প্রচলিত করেছিলেন। বসন্ত ঋতুর আগমনী এই বসন্তোৎসবের মাধ্যমেই আমরা করে থাকি। প্রকৃতিই নানাভাবে আমাদের বসন্তোৎসবে প্ররোচিত করে।

এতক্ষণ প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে যে সব ভাবনাচি ন্তার কথা বলা হল, রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু তার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন, অর্থাৎ প্রয়োগের দিকে না গিয়ে শুধু তত্ত্বগত চিন্তা করেই সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে পরিবেশচিন্তার ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী মানুষ হিসেবে তাঁকে আমরা গণ্য করতাম কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক বা শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি নিজের প্রকৃতি ও পরিবেশকে যে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তার বড় উদাহরণ শান্তিনিকেতনের 'শ্যামলী' নামের মাটির বাড়িটি। মাটিতো প্রকৃতিই দান। আমাদের মত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সংবেদনশীল বাঙালির নান্দনিক বোধের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান এক পরম প্রাপ্তি, এক দুরন্ত আকর্ষণের বস্তু। আমাদের প্রকৃতিবোধ, প্রকৃতি সম্পর্কে অধিকাংশ ভাল লাগা, প্রতিক্রিয়া এসেছে বা শিখিয়েছেন প্রকৃতিনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ।

মো. রেফুল করিম
রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী
শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

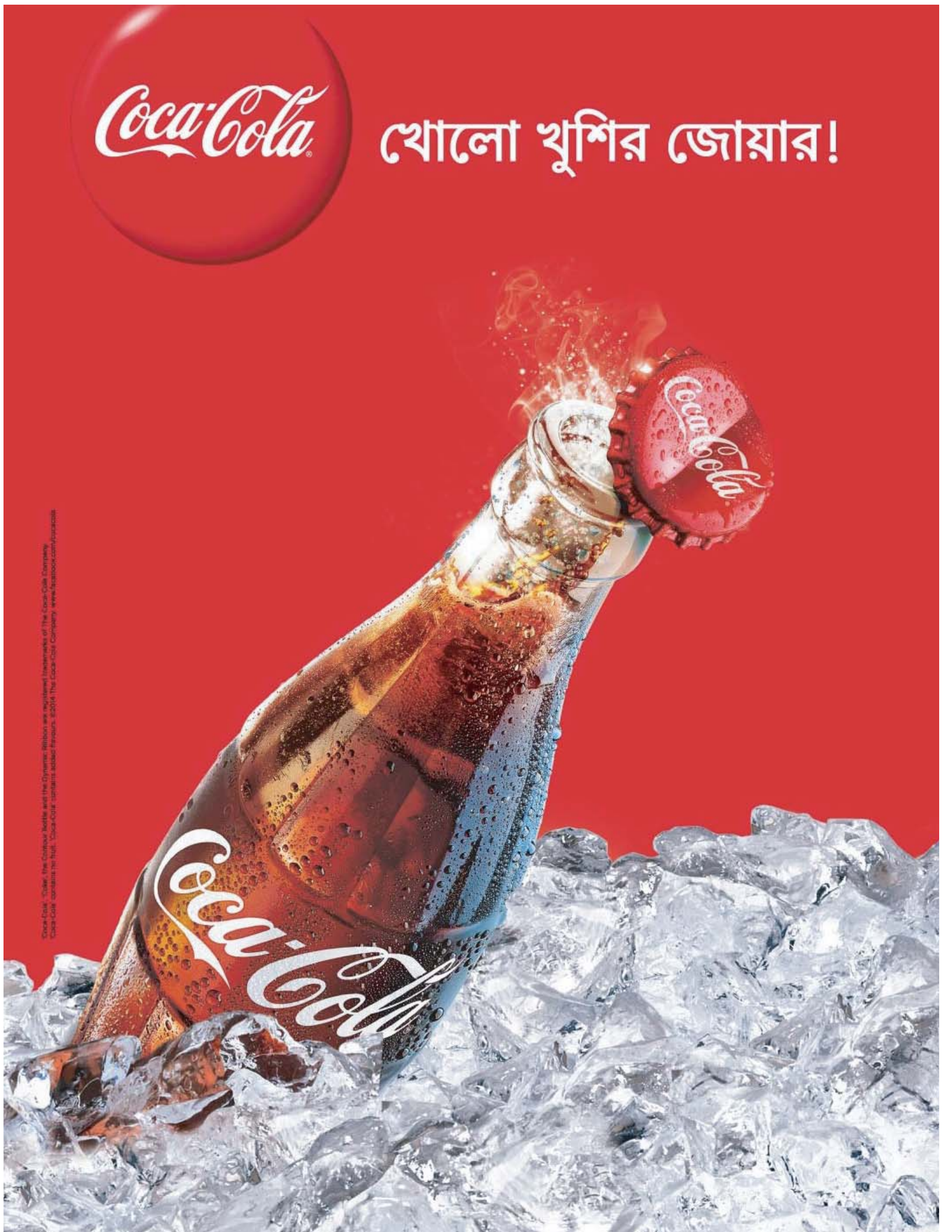
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন ড. দুলাল ভৌমিক

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিৰা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু কি শোল্পযুল্পব ৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিৰালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজসরল ভাষায় এমন আ শ্চর্য ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিক্লাই রাজা বি ক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যুষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। এ্কা জে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরু হল রম্ভাউর্বশীর নৃত্য গীতের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ক্ষমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্যখচিত একটি ব হুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভৰণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে ক্কিনা তা অনুস ন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপ-িত বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা ক্কিনা।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিক্ষেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগ্নয জ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্যবীর্য, দয়াদা ৰিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

এ পর্যন্ত আমরা উনবিংশটি পুতুলের গল্প শুনেছি। এবার শোনা যাক বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ পুতুলের গল্প:

বিংশ পুতুলের গল্প

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণে উদ্যোগী হলেন। তখন বিংশ পুতুল তাঁকে বলল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নিঃস্বার্থ হন, তাহলে এই সিংহাসনে বসার উপযোগী বিবেচিত হবেন।

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিরূপ নিঃস্বার্থ ছিলেন?

পুতুলটি বলতে লাগল: মহারাজ একদিন দ্বাদশ যোজন দূরে এক দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় তীর্থ দর্শনে যাচ্ছিলেন। সেখানে ত্রিকালনাথ যোগীশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। যেতে যেতে পথশ্রান্তি দূর করার জন্য তিনি পদ্মালয় নামক নগরে এক জলাশয়ের তীরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন আরো চারজন ভিনদেশী ঐ তীর্থে যাওয়ার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন: আর পারছি না। আমাদের বোধহয় আর তীর্থ দর্শন হবে না।

তা শুনে মহারাজ বললেন: বিনা উদ্যমে কিছু হয় না। চেষ্টার দ্বারা দুর্গতিও দূর হয়। স্বয়ং মধুসূদন সমুদ্র মন্থনের কষ্ট স্বীকার করেছিলেন বলেই লক্ষ্মীকে লাভ করতে পেরেছিলেন। সুতরাং এতদূর এসে পথশ্রমের ভয়ে তীর্থ দর্শন না করে কেন আপনারা ফিরে যাবেন? আমার সঙ্গে চলুন। আমি পারলে আপনারাও পারবেন।

মহারাজের কথায় উদ্যম ফিরে পেয়ে তাঁরা তীর্থের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। কয়েক যোজন পথ পার হওয়ার পর হঠাৎ পথে পড়ল এক ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ। মুহূর্তে সাপটি এসে মহারাজের পায়ে ছোবল মারল। মহারাজ বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে এক খণ্ড বস্ত্র দিয়ে দষ্টস্থান বেঁধে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। এভাবে তাঁরা একদিন পৌঁছলেন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত তীর্থস্থানে।

মহারাজ গভীর ভক্তি সহকারে যোগীশ্বরের মন্দিরের সামনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিষের জ্বালা দূর হয়ে গেল।

মহারাজের ভক্তি দেখে যোগীশ্বর শিব সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে জিজ্ঞেস করলেন: কি কামনায় এত কষ্ট করে এখানে এলেন?

উত্তরে মহারাজ বললেন: কোন কামনা নিয়ে আসিনি। এসেছি শুধু ত্রিকালনাথ যোগীশ্বরকে দর্শন করতে।

মহারাজের একথায় যোগীশ্বর অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি তখন স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে মহারাজকে তিনটি জিনিস দিলেন– একটি কাঠি, একটি যোগদ- ও একটি ঘুঁটি। আর বললেন: এই কাঠি দিয়ে মাটিতে ন্লেকটি দাগ টান বে, একদিনে তত যোজন পথ অতিক্রম করবে। ডান হাত দিয়ে এই যোগদ-টি স্পর্শ করলে সমস্ত মৃত সৈন্য পুনর্জীবন লাভ করবে। আর এই ঘুঁটিটি সমস্ত শত্রুসৈন্য বিনাশ করবে।

মহারাজ শ্রদ্ধাভরে সেগুলো গ্রহণ করে

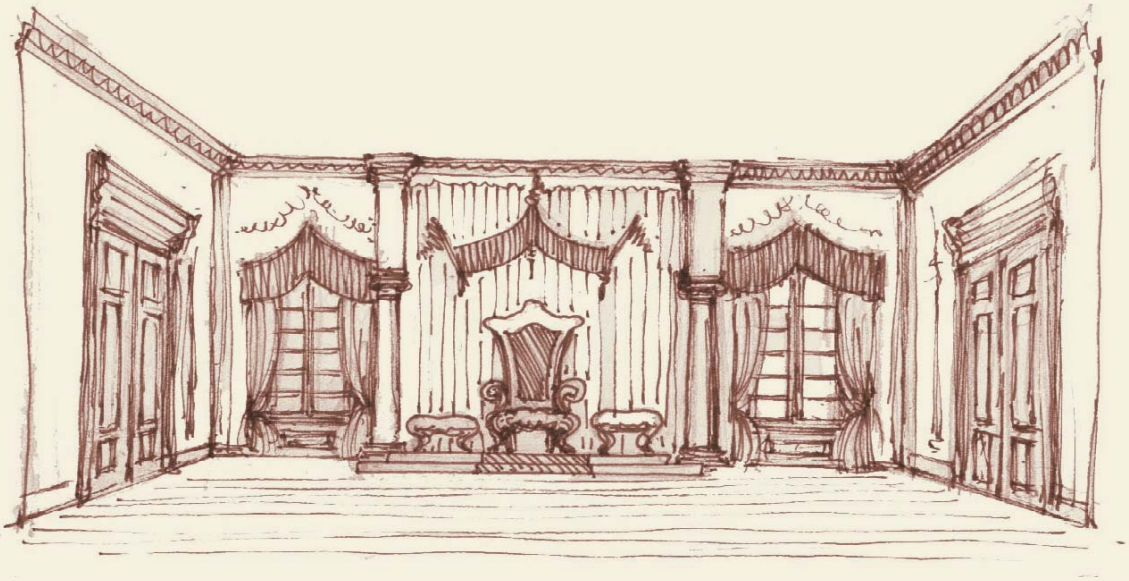

যোগীশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

কয়েক যোজন পথ অতিক্রম করার পর তিনি দেখতে পেলেন এক রাজকুমার কাষ্ঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে। কাছে গিয়ে এর কারণ জানতে চাইলে রাজকুমার বলল: সমস্ত আত্মীয় স্বজন মিলে তার রাজ্য দখল করে নিয়েছে। সে এখন সর্বস্বান্ত। এ অবস্থায় তার পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। তাই সে আগুনে আত্মাহুতি দেবে।

মহারাজ তাকে আত্মাহুতি দেয়া থেকে বিরত করলেন এবং যোগীশ্বর প্রদত্ত দিব্য জিনিসগুলো তাকে দান করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পুতুলের মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই নিঃস্বার্থপরতার কথা শুনে ভোজরাজ নির্বাক ও নিশ্চল হয়ে রইলেন।

একবিংশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণে প্রয়াসী হলে একবিংশ পুতুলটি তাঁকে বলল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পরার্থপর হন, তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ বললেন: কি রকম?

পুতুলটি বলল: মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এক মন্ত্রী ছিলেন– বুদ্ধিসিন্ধু। তাঁর একমাত্র পুত্র অনর্গল ছিল মূর্খ। এজন্য তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে: অজাত, মৃত ও মূর্খ– এই ত্রিবিধ পুত্রের মধ্যে প্রথম দুটি বরং ভাল, কারণ এরা দুঃখ দেয় অল্পদিন, কিন্তু মূর্খপুত্র যাবজ্জীবন পিতামাতার দুঃ খের কারণ হয়। এসব বলে বুদ্ধিসিন্ধু সর্বদা পুত্রকে ভর্ৎসনা করতেন।

পিতার ভর্ৎসনা সহ্য করতে না পেরে অনর্গল একদিন দেশান্তরী হল। নানা দেশ ভ্রমণ করে নানা পণ্ডিতের নিকট থেকে সে জ্ঞান অর্জন করল। এভাবে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে সে একদিন গৃহে প্রত্যাগমন করছিল। পথে এক গভীর বন পড়ল। সেই বনের মধ্যে এক মন্দির দেখতে পেল। মন্দিরের পাশে এক সরোবর। হঠাৎ দেখল সেই সরোবর থেকে আটজন দিব্যাঙ্গনা উঠে আসছে। তারা মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহের পূজা করল। তারপর আবার বেরিয়ে এল। যাবার সময় তারা অনর্গলকে তাদের অনুসরণ করতে বলল। কিন্তু অনর্গল ভয়ে তাদের অনুসরণ করল না।

অনর্গল রাজ্যে ফিরে মহারাজকে সব খুলে বলল। সব শুনে মহারাজের ভীষণ কৌতূহল হল। তিনি কালবিলম্ব না করে অনর্গলকে সঙ্গে নিয়ে সেই সরোবরের তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অঙ্গনারা সরোবর থেকে উঠে এল। তারপর মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহের পূজা সেরে বেরিয়ে এল। যাবার সময় তারা মহারাজকে তাদের অনুসরণ করতে বলল। মহারাজ নির্ভয়ে তাদের অনুসরণ করলেন। সরোবরের মধ্য দিয়ে সেই অঙ্গনাদের সঙ্গে গিয়ে তিনি এক বিস্ময়কর রাজ্যে উপস্থিত হলেন। বিভিন্ন রত্নখচিত সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ দেখে তিনি মোহিত হলেন। অঙ্গনারা তাঁকে ঐ রাজ্যের রাজা হওয়ার অনুরোধ করল। কিন্তু মহারাজ নিজের রাজ্য ও প্রজাদের কথা ভেবে সম্মত হলেন না। মহারাজের এই নির্লোভ মনোভাব দেখে অঙ্গনারা খুশি হয়ে তাঁকে আটটি মূল্যবান রত্ন উপহার দিল। মহারাজ রত্নগুলো গ্রহণ করে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পথে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ বলেন: মহারাজ! আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ঋণভারে জর্জরিত। নীতিশাস্ত্র বলে– ধনহীন ব্যক্তিকে স্ত্রীও পরিত্যাগ করে। তাই দেশান্তরী হওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় নেই।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহারাজের করুণা হল। তিনি সেই আটটি রত্নই ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে মহারাজকে আশীর্বাদ করে বাড়ি ফিরে গেলেন। আর মহারাজও প্রসন্নচিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই বলে পুতুলটি থামল এবং ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বাবিংশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করতে উদ্যত হলে দ্বাবিংশ পুতুল বলল: রাজন! আপনি এই সিংহাসনে বসতে পারেন, যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পরার্থে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকেন।

ভোজরাজ জানতে চাইলেন, কি কারণে মহারাজ বিক্রমাদিত্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

পুতুলটি বলল: একবার মহারাজ পর্যটনে বের হয়েছেন। পথে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা। ব্রাহ্মণ তাঁকে মিনতি করে বললেন: মহারাজ! অদূরে ঐ নীল পর্বতের চূড়ায় কামাখ্যা দেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরের ভেতরে পাতালে যাবার একটি সুড়ঙ্গ আছে। কিন্তু সুড়ঙ্গের দ্বার সর্বদা বন্ধ থাকে। একাগ্র মনে দেবীর আরাধনা করলে দেবী যদি তুষ্ট হন তবেই সুড়ঙ্গের দ্বার খুলবে। সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে একটি রসকু- আছে। সেই রস দিয়ে স্বর্ণ প্রভৃতি অষ্ট ধাতু তৈরি হয়। আমি বারো বছর যাবৎ দেবীর সাধনা করছি, কিন্তু দেবীর কৃপা পাইনি।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহারাজ সেই নীল পর্বতে গেলেন এবং একাগ্র চিত্তে কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। কিন্তু দেবীও প্রসন্ন হচ্ছেন না, সুড়ঙ্গের দ্বারও খুলছে না। মহারাজ তখন তরবারি দিয়ে নিজের কণ্ঠ ছেদন করতে উদ্যত হলেন। মহারাজ যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে দেবীর সাধনা করেছেন এবং পরার্থে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছেন, সেহেতু দেবী তাঁর সাধনায় প্রসন্ন হলেন। তিনি মহারাজের উদ্দেশে বললেন: বৎস! আমি তোমার আরাধনায় প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।

মহারাজ বিনীতভাবে বললেন: হে দেবী! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তাহলে এই ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণ করুন। সুড়ঙ্গের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। দেবী 'তথাস্তু' বলে দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় মহারাজ খুশিমনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পুতুলের মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই পরহিতব্রতের কথা শুনে ভোজরাজ নীরব হয়ে রইলেন।

● পরবর্তী সংখ্যায়

ড. দুলাল ভৌমিক
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

চারনম্বর এক্সারসাইজ খাতার পাঁচটি পাতায় লেখা একটি গল্প। কী ইচ্ছে হয়েছিল বড় জারুল গাছতলায় পা ছড়িয়ে ও পড়বে, ওরা শুনবে। অর্জুন গাছের নিচে ঘাসের কার্পেট ঠিক তেমনি আছে। তেমনি আছে পুকুর। তেমনি আছে চারপাশের গাছপালা। তবু কী নেই, কী হারিয়ে গেছে ভাবতে ভাবতে সে চারপাশে তাকায়। গাছপালা ফিস ফিস করে বলছে– মৌটুসি আমরা তোমায় ভুলিনিগো মেয়ে। ওরা তখন ওপারে। পরী ও পরাণের মাঝখানে পানির সাপ ভাসিয়ে স্থলপদ্মের ঢল ঢল মুখ।

ও আস্তে আস্তে খুঁজে ফেরে সেই দিগন্ত। যেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ আর মাটির ভালবাসা দেখেছে। আদর করছে একজন আর একজনকে। সেই অপরূপ ঘ্রাণভরা মাঠ। সেখানে সে তাকিয়ে থাকে– আকাশ আর মাটির দিকে। দু'একজন ওকে চেনে। কিছু পেয়ারা ও লেবু পেয়ে যায় উপহার। ও কালোকে দেখে। কালো ওকে দেখে পালিয়ে যায়। ও এখন পরীর বেড়াল। কালো, পরী ও পরাণের জগতে ও এখন এক অপ্রয়োজনীয় বস্তু। একেবারে অনেকদূরের একজন। কারণ? সময়? না শূন্যপূরণের খেলা– যেখানে ফট করে আর কেউ এসে জায়গা করে নেয়।

রিকশায় ওর ফোঁত ফোঁত শুনে পাগলচাচা বলেন– সর্দি! এক দাগ ব্রায়োনিয়া খেয়ে নেবে বাবার হোমিওপ্যাথির বাক্স থেকে। ও কথা বলে না। পাগলচাচা তখন মহাউৎসাহে এক ব্যায়ামবীরের গল্প করছেন। ওর ঠাণ্ডা লাগা সেরে যাবে।

শূন্যপুরণের খেলা প্রথমবারের মত জানে ও। চোখে ভাসতে থাকে পরী ও পরাণের মাঝখানের স্থলপদ্মের মুখ। ও কী ঈর্ষায় কাতর! কীসে যে কাতর বুঝতে পারে না তবে সেবার ওর ঠাণ্ডা সারতে সময় লাগে।

মা একদিন গলায় ওড়না ঝুলিয়ে বলেন– আজ থেকে ওড়না। এমন দুঃখপর্ব এত তাড়াতাড়ি আসবে ও ভাবেনি।

মৌটুসি সে ওড়না ফেলে দিল। মনে মনে ভাবল যতবার মা তাকে এমন ওড়না দেবে ও ফেলে দেবে। বলবে চোর ওড়না চুরি করেছে। গলার সাপের সঙ্গে আবার সমঝোতা কী? কিংবা বলবে– চোর এসেছিল। হাজি মোহাম্মদ মহসিনের মত ও চোরকে ওড়না দিয়ে দিয়েছে। ও সাপের বশ্যতা এত তাড়াতাড়ি মেনে নেবে? হতেই পারে না। সব কিছু ছাপিয়ে জেগে রইল 'মুনিয়া আবির ও পরিমলের এক বিকেলের' না পড়া গল্প। ওর খাতায় ফুটে রইল একটি অপূর্ব ভাললাগা, ফিনকিফোটা সময়। মৌটুসি গান করছে– শান্ত নদীটি/ পটে আঁকা ছবিটি। আর পরাণ গলা মিলিয়ে গান গাইতে চেষ্টা করছে। আকাশে বিশাল সোনালি চাঁদ।

ওরা কী খুব তাড়াতাড়ি যশোরে চলে যাবে? আর কী পরী ও পরাণের সঙ্গে দেখা হবে না? ভাবতে ভাবতে অনেক দিন কেটে গেল ওর। টুম্পা তেমন আর আসে না। জানালায় বসে পাখি দেখল ও। আর ভাবল এইসব পাখিরা কোথা থেকে আসে?

কা জ ল

আট.

সকালের আলোরোদ চারপাশে। নিরিবিলি ঝকঝকে বারান্দায় আপনমনে কাজল উল বুনছে। বারান্দার সামনে মাঠ। আর মাঠের কাছে বেতফল ঝোপ আর বেতফলের বন। শীতের সকাল। মিঠে রোদে পা ছড়িয়ে বসে আপনমনে উল বুনতে ভালবাসে কাজল। নতুন শেখা সাপের ফনার মত গলার মাফলার। পায়ের শব্দে চোখ তোলে। ডাকপিওন। পিঠে থলে চাপিয়ে একেবারে সামনে। এমন দৃশ্যে খুশি কাজল। একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ডাকপিওন হাতে তুলে দেয় অনেকগুলো চিঠি। তিনটে বাদামি। ওগুলো আব্বার চিঠি– এসেছে নানাসব স্কুল থেকে। যে সব স্কুল তিনি ভিজিট করতে যাবেন এবং যে সব স্কুল ভিজিট করে এসেছেন তাদের চিঠি। একটি বিদেশের। নিশ্চয়ই রবিভাইয়ার চিঠি। আর একটি আকাশের মত নীল। কাজল জানে আকাশের মত নীল চিঠিটি কার। এটি বুবুর। তিনি খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন। রীনু, বীনু ও চুমকির পরে যে আবার এসে পড়বে তারই কারণে। বুবু এসময় মার কাছে চলে আসেন।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে মার হাতে চিঠি দিতেই তিনি তব্বুনি পড়ে ফেলেন। আর পড়ে ফেলে হেসে বলেন– রেবা আসছে। সামনের রবিবার।

মিঠুপা ওর ঘর থেকে বাইরে এসেছে। পরীৰার আগে মিঠুপা খুব বেশি ঘর থেকে বাইরে বেরোয় না। কোন খবর শোনে না। এত যে প্রিয় অনুরোধের আসর– তাও নয়। কেবল পড়া আর পড়া। ভোলানাথের লজিক আর মায়ার্সের ইতিহাস। খানিক আগে শ্রীশবাবু চলে গেছেন। যাঁর কাছে মিঠুপা লজিক আর ইকোনমিক্স পড়েন। আর আব্বার কাছে ইংরেজি। মা মিঠুপার দিকে চেয়ে বলেন– রেবা আসছেরে মিঠু। মিঠুপার চোখেমুখে সে খবর খুব বেশি খুশির ছায়া ফেলে না। সে কেবল বলে– সামনে আমার পরীক্ষা।

পরীক্ষা মানে তো এই নয় যে চাঁদ সূর্য উঠবে না। পৃথিবী থেকে জন্মমৃত্যুর পর্ব শেষ হয়ে যাবে। মায়ের গলায় একটু রাগ।

আমি তা বলছি না। বলেন মিঠুআপা। আমি বলছি এবারে কিন্তু আমার ঘাড়ে রীনু, বিনু আর চুমকির দায়িত্ব দিতে পারবে না। আর কাজল তোমার ওই সব জঞ্জাল কোণের ঘর থেকে সরিয়ে ছাদে তোলো।

মৌটুসি নামটা কবে যেন টিকটিকির লেজের মত খসে গেছে। যশোরে ওরা ছিল এক বছর। তারপরই ফরিদপুরে। মৌটুসি ফরিদপুরের প্রেমে পড়ে গেছে। এখন সকলে ওকে ডাকে কাজল বলে। মা পর্যন্ত। কেবল রবিভাইয়া ভুল করে চিঠি লেখেন– আমার ছোটবোন মৌটুসি। তারপর বাকি চিঠিটা শেষ করেন কাজল নাম লিখে।

কাজল বুঝতে পারে ওই কোণের ঘরই হবে বুবুর আঁতুড় ঘর। যে ঘরের বাক্সে কাজলের পুতুলের রাজ্যপাট। টিনের বড় টফির বাক্সে পাখির পালক, মাছের দাঁত, কড়ি, শঙ্খ। শঙ্খ দিয়েছে পাশের বাড়ির মমতা। মমতার সঙ্গে ওর এখন গলায় গলায় ভাব। যশোরের ইরাবতী কর্মকারকে এখন আর মনে পড়ে না। কেবল দুই একদিন পরীর কথা বা পরাণের কথা মনে পড়ে। তারপর ভুলে যায়। ও তাকিয়ে দেখে কড়ি। কড়িগুলো নিয়ে দুপুরের বারান্দায় নানা সব খেলা হয়। কখনো মমতা। কখনো আর কেউ। আর খেলে ওরা লুডো আর কাটাকাটি। এই ঘরে শুধু আসতে পারে মমতা। ও আর মমতা চালতামাখা, বড়ইমাখা খায়। মমতার এমন কোন নিজের ঘর নেই। ওর অবশ্য একটি টিনের টফির বাক্স আছে যা ও রেখে দেয় ওদের শোবার ঘরের চকির নিচে। মমতাদের বাড়ি ছোট। অনেকগুলো ভাইবোন।

মিঠু ঠিকই বলেছে এসব এবার তাকে সরিয়ে ছাদে নিয়ে রাখতে হবে।

আমি এবারে ব্যস্ত। বলেন মিঠুআপা। ওর পরীৰার রেলগাড়ি হুড়মুড় করে এসে লাগবে রাজেন্দ্রকলেজের পাটফর্মে। আর মিঠুআপা আকাশ থেকে একটি তারা এনে সেই ট্রেনের ইঞ্জিনে লাগিয়ে ট্রেনকে ফেরত পাঠাবে পরীক্ষক মহলে। তারপর? পরীক্ষক সেই তারা রেখে ওর পরীক্ষা পাশের তালিকায় আর একটি তারা এনে বসাবেন। এ ঘটনা যে ঘটবে সে ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। মারও নেই। মিঠু আইএ পরীক্ষায় তারা পাবে। যেমন ও পেয়েছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষায়। মিঠু সকালে উঠে নামাজ পড়ে। মিঠু কোন কোনদিন কোরাণ শরিফ পড়ে। মিঠু পড়াশুনোর কারণে চাঁদ ও সূর্যের খবর রাখে না। পাড়ার কোন বখাটে ছেলের সঙ্গে কথা বলে না। মিঠু ভাল। মিঠু সুন্দর। মা মিঠুকে নিয়ে গর্ব করেন।

এবারে রীনু, বীনুকে দেখবে কাজল। এবারে ওই সবাইকে সময় দেবে, সঙ্গ দেবে। মা বলেন।

গতবার চোখে সাবান লেগে যে পরিত্রাহি চিৎকার করেছিল বীনু তা মনে আছে কাজলের। রীনু, বীনুরা ওর পুতুল নয়। ওরা এমন জোরে চিৎকার করে কোন কিছু পছন্দ না হলে, কাজলকে যার জের সামলাতে হয়।

কাজল চুপচাপ যে? মা কাজলের মুখের দিকে তাকান। কাজলের পনেরো হতে এখনো ছ'মাস বাকি। বা তাতে কি? নারী মুক্তির বক্তৃতায় বিখ্যাত বাবা, বড় মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছিলেন। রেবাবু কাজলের বয়সেই একটি মেয়ের মা হয়েছিল। কারণ? রেবাবু কালো। রেবাবু সাধারণ। রেবাপু মিঠুপার মত সুন্দর নয়। বুবুকে বিকোতে বাবার হিমশিম অবস্থা হয়েছিল। বুবু তখন মাত্র ক্লাশ এইটের ছাত্রী।

বাবা গরু খোঁজার যন্ত্রণা পেয়েছিলেন।

কাজল বলে, পারব। যদি মনে কর আমি এসব পারি।

তাহলে এই ঠিক থাকল। বলেন মিঠুপা। –ওতো পড়তে না পেলেই বেঁচে যায়। সারাক্ষণ ছুতো খোঁজে কেমন করে না পড়া যায়।

কাজল মিঠুপার বেণীতে মৃদু টান দিয়ে বলে– আমি তোর মত মাদাম কুরি হতে চাই না।

তুই কি হতে চাস আমি জানি। মিঠুপা কখনো ওকে তুমি কখনো তুই বলে। কাজল সবসময় তুই।

তুই কচু জানিস।

এ বাড়ির গাছেদের পাখিদের জগতে যেসব কেচ্ছাকাহিনি কাজলের মাথায় ও মনে এসে ভিড় করে তা মিঠুপার জানা। কাজল অবশ্য এখনো কাগজেকল মে এসব লেখেনি। সেই কবে দুটো গল্পের মত কী যেন লিখেছিল, তারপর আর নয়। তবু মিঠুপার ১৬০ আইকিউ কেমন করে যে সব বুঝে ফেলে সেই এক রহস্য। কাজল মিঠুপার দিকে তাকায়। চোখে চোখে প্রশ্ন করে– বলতো আমি কি হতে চাই?

মিঠুপা কাজলকে পাঠ করতে চায়। বলে– আসলে কাজল হতে চায় এক মস্ত বড়লোকের বউ?

এবারে মিঠুপার চুলে বিশেষ জোরে টান দিয়ে কাজল বলে– তুই কিচ্ছু জানিস না।

মিঠুপা ওকে ধরে ফেলবার আগেই কাজল হাওয়া। তারপর যখন বাড়িতে আসবে হয়তো কাজল দেখবে বাবার চেয়ারের পাশে মোড়া পেতে মিঠুপা 'সাম অফ লাইফ' না হলে 'ক্যানোন টু লেফ্‌ট অফ দেম, ক্যানোন টু রাইট অফ দেম, ক্যানোন ইন ফ্রন্ট অফ দেম, ভলিড এ্যান্ড থানডারড' শুনছে এবং বুজছে। আর মিঠুপার 'ভলিড এ্যান্ড থানডার্‌ড' শোনার আগে কাজল উধাও। উধাও এমন সব জায়গায় যেখানে ওকে কেউ খুঁজে পাবে না। এমনকি মমতাও নয়।

রীনু, বীনু ও চুমকি। এবারে ওরা থাকবে কাজলের দখলে। রাতে আলো নিভিয়ে যে সব গল্প করবে কাজল তাতে তিনজন দলা হয়ে যাবে। আর কাজল নানা সব গলা বানিয়ে, বিভিন্ন কণ্ঠস্বরে সেই দলাকে পোটলা করবে। কি যে মজা বানিয়ে বানিয়ে গল্প করতে। ভাবে কাজল। বানালে নিজেই কত কিছু হওয়া যায়। কাজল কখনো হতে পারে রাজকুমারীর মত, আবার কখনো একেবারে রাক্ষুসী। এই মজার কথা ও মমতাকে বলেছে। বানানো গল্পের কথা। মমতা ওর সব কথা মন দিয়ে শোনে। মমতা ওকে ভালবাসে।

নয়.

আলিপুরের মাঝামাঝি ওদের বাড়ি 'নিরিবিলি'। চারপাশে গাছ। আতা পেয়ারা বড়ই নারকেল জামরুল ও বাতাবিলেবু আর দীঘল সব সুপুরি নারিকেল। যে হিন্দু ভদ্রলোক বিশেষ শখে বাড়িটি বানিয়েছিলেন তিনি চলে গেছেন কলকাতা। এখন বাড়িটা পূর্বপাকিস্তান সরকারের। কাজলের আব্বা ভাড়া দিয়ে থাকেন সেখানে, সপরিবারে।

ছাদে দাঁড়িয়ে পেয়ারা ছিঁড়ে খেতে মজা। মা বলেন এগুলো কাঁশীর পেয়ারা। হয়তো পান্না ভাইয়ের আব্বাজান বলবেন– মদিনার পেয়ারা। কাঁশী বা মদিনা যাই হোক খেতে ভাল এই সব পেয়ারা। চেয়ে দেখে সেই সব পাখিদের যারা ঋতুতে ঋতুতে রং বদলায়। এ বাড়ির কোণের পুজোর ঘরটি এখন কাজলের পুতুলের সংসার। ওর নিজের জগত। বড় বড় গাছের মধ্যে জাহাজের মত জেগে আছে 'নিরিবিলি'। যেখানে পেয়ারা গাছের নিচু ডালে পা ছড়িয়ে বসে কতসব গল্প মাথায় চলে আসে। কখনো সে রাজকুমারী। কখনো অন্যকেউ। এই খেলাটা বেশ। মনে মনে ভাবে কাজল। ইচ্ছেমত নিজেকে এক একটি চরিত্র করে ফেলা। অবশ্য চরিত্র শব্দটা তখনো ওর শব্দকোষে ছিল না। তখন যা ভাবত সে এমন– কল্পনায় আমি যে কোন একজন হয়ে যেতে পারি। একবার এক্সারসাইজের খাতায় লিখেছিল– আকাশে আকাশে কাজল। কল্পনায় ও তখন এয়ার হোস্টেস। যখন লেখে সাগরে সাগরে কাজল। ও তখন জাহাজ নিয়ে মহাসমুদ্রে একা হিমশিম।

এখন কাজল ওদের ও মমতাদের বাড়ির মাঝখানে। দূরে কোথাও যায়নি। দিগন্তের কাছে নয়। মাঠের ওপারে নয়। মমতার বাড়ির কাছে।

মমতা এই মমতা। ডাক দিল কাজল।

অতসির হাত ধরে এগিয়ে এল মমতা। পরনে সেই ডুরে শাড়িটা। যা ও পুজোর ফুল তুলতে না হলে বড়ি দিতে পরে থাকে। –কি ব্যাপার কাজল ডাকছিলি?

মমতা বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ায়।

অতসি হাত ছাড়িয়ে চলে গেছে। কাজল বলে– রেবাবু আসছে।

বোধকরি কারণ সেই? ব লেই মুখ টিপে হাসে মমতা।

–একেবারে সেই। বাচ্চা হতে। তোর মেজদির মত। খুব বাচ্চা হয় রেবাবুর।

খুব বাচ্চা হয় মেজদির। এই বলে মমতা আবার হাসে। কাজলও। –হবে না কেন দু'জনে একদিনের জন্য কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। একসঙ্গে ঘুমোয় প্রতিদিন।

একসঙ্গে ঘুমানো এবং সন্তান জন্মের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকলেও ব্যাপারটি পরিষ্কার নয়। তবু এই বলে দু'জনে হি হি করে হাসে।

অতসিদের বাগানের কচুগাছে একটি ঢাউস প্রজাপতি এসে বসেছে। কাজল বলে– মম প্রজাপতিটাকে ধরে দেনা।

মমতা বলে– কিযে বিশ্রী অভ্যাস তোর কাজল। প্রজাপতি ধরে রাখা। কাজল একটি বড় কাগজে এদের ডানা আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখে। সেই পাখার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ও বলে– আমি না ধরলেই ওগুলো যেন হাজার বছর বাঁচত। আমি জানি খুব তাড়াতাড়ি মরে যায় প্রজাপতি।

তবু মরে যাওয়া আর মেরে ফেলার মধ্যে পার্থক্য আছে না। মমতা বলে।

ধরবি কিনা বল। মমতা প্রজাপতি ধরতে পারে না। ফুটকি ফুটকি নক্সা নিয়ে কোথায় যে হারায় প্রজাপতি কে জানে।

ইস। তুই না একটা–

মমতা কিছু বলে না। বোঝা যায় প্রজাপতি চলে যাওয়াতে ও খুশি হয়েছে।

এবারে রীনু বীনুর দায়িত্ব আমার। মিঠুপার পরীক্ষাতো তাই।

তার মানে এবারে ওরাই তোর পুতুল।

কি যে বলিস। এক একজনের গলার ভেতর মাইক বসানো। কিছু পছন্দ না হলে এমন চিৎকার শুরু করে। চাইলেও থাপ্পড় মারা যায় না। ওদের নানি নানা খালা আমাকেই তুলোধুনো করবে তাহলে। তবে একটা কাজ করতে পারব। আলো নিভিয়ে এমন সব গল্প বানাব, ওরা

আর সাঁতারে দশবার এপার-ওপার করতে পারে কাজল। এ বাড়িটার নাম 'নির্ঝর'। যে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল পারুল আর পান্না। পান্না পারুলের ভাই। পারুলের কনুই পর্যন্ত কাচের চুড়ি সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। গতকাল চুড়িওয়ালি ডেকে চুড়ি কিনেছে পারুল। পান্না এবার মিঠুপার সঙ্গে আইএ পরীক্ষা দেবে। টাইফয়েড থেকে উঠবার পর চুল ন্যাড়া মাথা করেছিল। এখন সেখানে নধর শ্যামল ঘাসের মত চুল উঠছে। কিছদিন আগে জানালায় দাঁড়িয়ে কাজল 'ন্যাড়া মাথা, ন্যাড়া মাথা' করেছিল।

শুনতে শুনতে দলা হয়ে যাবে। তারপর দলা থেকে পোটলা। একেবারে কুকুরকু-লী তারপর বেনের পুঁটুলি।

মমতা হেসে ওঠে। সাদা দাঁত আরও দুধসাদা হয়ে যায় হাসলে। বলে– দি আইডিয়া।

আইডিয়া আরো আছে। তবে আপাতত একটিই বললাম।

দুপুর নিবিড় হয়ে গেছে মমতাদের বাগানে। মমতা বড়ি দিয়েছে। যে সময় কাজল ওকে ছুঁতে পারে না। ছুঁতে পারে না যখন ও পুজার ফুল তোলে। বলে ও– কি যে সব কা-কারখানা তোদের। তবু মমতাই চুপি চুপি দুপুরবেলা মাঠাকমা ঘুমি য়ে থাকলে ওকে হাত ধরে নিয়ে যাবে রান্নাঘরে। কাজল বলে– আজ চল পারুলদের পুকুরে। মজা হবে।

দেখি মাকে বলে। তোকে মাসিমা যেতে দেবেন?

দেখি। হয়তো দেবেন।

তা হলে দেখা হচ্ছে পুকুরঘাটে।

ঠিক সময়ে আসিস।

আচ্ছা কাজল এইসব প্রজাপতি ধরাটরা তুই ছেড়ে দিতে পারিস না। তোকে না কেমন খুনী খুনী লাগে।

তাই নাকি? তুই কি তাহলে প্রজাপতির ত্রাণকর্ত্রী। ওদের বাঁচাব এমনি ব্রতে নিবেদিত?

ঠাট্টা? মোটেই নয়। ব্যাপারটি ভাববার।

আচ্ছা ভাবব। বলে কাজল।

বাড়িতে ঢুকে চারপাশে তাকায়। মিঠুপা নামের কড়াশাসন ভীমনাগের সন্দেশ আশেপাশে কোথাও নেই। মিঠুপা রেবাবুর মত নয়। মা বলেন– আমার রেবা মাটি। বসুন্ধরা। আর কাজল জানে মিঠুপা কখনো সুর্য। হঠাৎ হঠাৎ চাঁদ। তবে সেই চন্দ্রত্বপ্রাপ্তিও হঠাৎ। আর কাজল? এখনো ওসব কিছু না। গিরগিটির মত কোন গাছের প্রাণী। কুচুরিপানার মত কোন পানির গুল্ম। ফণিমনসার ব নের ব্যাং। না হলে গাছের ডালে বসে থাকা কোন এক পাখি। দড়িতে মিঠুপার হলুদ শাড়িটা ঝুলছে। তার মানে ওর গোসল হয়ে গেছে। মা রান্নাঘরে। শশার সালাদ করছেন। পাতিলের ঢাকনিগুলো ভেজা ত্যানায় মুছছেন। ঝকঝক করছে। এইসব ত্যানার নামও আছে, দোসমাল। কাজল প্রথম পাতিলের ঢাকনি উঠিয়ে যে গন্ধ পেল তার নাম সোনামুগের ডাল ও রুই মাছের মাথা। এরপরে পেল কৈ মাছের দোপেঁয়াজীর মত গভীর আকর্ষণ। তারপরে খোসাছোবড়া দিয়ে নিরামিষ। আব্বা যাকে বলেন 'তোর মায়ের ভিটামিন ভাজি'। সেটা তেমন আকর্ষণীয় নয়। যেমন আকর্ষণীয় নয় সকালের চিরতার পানি।

মা আমি আজ পারুলদের পুকুরে গোসল করব। ধপাস করে বলে ফেলল কথাটা কাজল। একটি শশা মুখে পুরে।

বড় হয়েছিস এসব ছাড়তে হবে।

যদিও সাপের মত ওড়নাটা গলায় ঝুলছে না তবু মা যে কেমন করে বুঝে ফেলে বড় হওয়ার কথা। কাজলের দিকে চেয়ে বলে– বড় মেয়েরা বাড়িতে গোসল করে।

বড় মানে জেলে ঢোকা নয়। বড় মানে কয়েদী নয়। আমি মিঠুপার মত কয়েদী হতে চাই না।

আমি চাই না আর হবে না এমন ব্যাপার ঘটে না এই জগৎ সংসারে। অনেককিছু মেনে নিতে হয়।

আজকের মত যাই? কাজল বলে। মায়ের গলা ধরে একটু ঝোলে।

মা গোসলে যাবেন। তারপর জোহরের নামাজ। বলেন– আজকের মত কেবল। মনে থাকে যেন।

কাজল রান্নাঘর থেকে বাইরে আসে।

দশ.

কাজলদের বাড়ির দক্ষিণে একটি মাঠ। তারপর পারুলদের বাড়ি। বাড়িটি কোন এক জমিদারের। এখন সে জমিদার কলকাতায়। তাই পারুলরা বাড়িটার পুরোটা দখল করে থাকে। বাড়িটার সবচাইতে বড় আকর্ষণ অতলান্ত দীঘির মত একটি পুকুর। বড় গভীর ঘাট বাঁধানো ছবির মত। এ পুকুরটি জমিদার বাড়ির অন্তরালবর্তিনীদের পুকুর ছিল। কাকচোখ স্বচ্ছ জল। চারপাশে গাছপালা। মাঝে মাঝে কাঠঠোকরা না হলে অন্য কোন পাখি। আর সন্ধ্যায় ঘাটে গল্প করতে বসে কখনো ঝিঁ ঝিঁ। কখনো ঝিলি-। এ ঘাটে বিকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাতে গল্প জমায় ওরা। গাছের ভেতর দিয়ে চাঁদ দেখা যায় যখন। অতুলনীয় সেই সময়। কখনও গান কখনও কবিতা কখনও নিষিদ্ধ গল্প। তারপর হি হি। তারপর হাসি থামিয়ে ওরা গাছপালার শব্দ শোনে।

আর সাঁতারে দশবার এপারওপার কর তে পারে কাজল। এ বাড়িটার নাম 'নির্ঝর'। যে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল পারুল আর পান্না। পান্না পারুলের ভাই। পারুলের কনুই পর্যন্ত কাচের চুড়ি সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। গতকাল চুড়িওয়ালি ডেকে চুড়ি কিনেছে পারুল। পান্না এবার মিঠুপার সঙ্গে আইএ পরীক্ষা দেবে। টাইফয়েড থেকে উঠবার পর চুল ন্যাড়া মাথা করেছিল। এখন সেখানে নধর শ্যামল ঘাসের মত চুল উঠছে। কিছদিন আগে জানালায় দাঁড়িয়ে কাজল 'ন্যাড়া মাথা, ন্যাড়া মাথা' করেছিল। এখনও কি সে কথা মনে আছে পান্নাভাইয়ের? না থাকলেই ভাল। কিন্তু প্রথমেই শোনা গেল পান্নার গলা। –কিরে চুলওয়ালি কি মনে করে আমাদের পুকুরে? বোঝা গেল পান্নাভাই এই দুপুরে মহৎ হবেন না। কাজল কোন উত্তর করে না।

একেবারে নির্বাক। মুখে রা নেই। ভয়ে না লজ্জায়?

কি হয় গোসল করলে আপনাদের পুকুরে। আপনাদের পুকুর কি ৰয়ে যাবে?

তা বোধকরি যাবে না। তবে তোমার মাথার প্রচুর গোবরে আমাদের পুকুর সারে ভরে যাবে। কতসব পদ্মফুল ফুটবে তখন। আমাকে ন্যাড়ামাথা বলার সময় মনে ছিল না এ বাড়ির পুকুর না হলে তোমার সাঁতার প্রাকটিস হয় না।

মমতা ফিক করে হেসে ওঠে। কাজল হাসে না। মমতার হাসি ও পারুলের হাসিতে রেগে যায় কাজল। বলে– চললাম। আমার গোসলের দরকার নাই। আপনাদের পুকুরের পানি শুদ্ধ থাকুক। জীবাণুমুক্ত থাকুক। একটাও পদ্মফুল না ফুটুক।

কাজল বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

আরে আরে করছিস কি? যাচ্ছিস নাকি? পান্নাভাই ঠাট্টা করছিল রে কাজল। উপর থেকে পারুল বলে।

চললাম সজারুচুল পান্নাভাই। এই বলে কাজল চলে যাবে বলে ঠিক করে। মমতা ডাকে– আমাকে আসতে বলে তুই চলে যাচ্ছিস? এ কেমন হল?

যেমনই হোক। এই বলে হাওয়া হল কাজল।

মিঠুপা অনেক সাবান খরচ করেছে। ওর বিয়ে হয়ে যাবে পরীক্ষার পর মা বলেন। মিঠুপার সেই বাক্সটা কাজল পাবে। কতকিছু যে সে বাক্সে। সব মিঠুপা ওকে দিয়ে দেবে ভাবে কাজল। আর মিঠুপার ঘর ওর হবে। কাজল বোধকরি সেই খুশিতে অনেকসময় ধরে গান করে– সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা। মিঠুপার বাক্সে নানা সব আতর, একশিশি নীল বলু-ইভনিং। ফিতে ও ক্লিপের সম্ভার। চিঠি লেখার কাগজ। পাখি আঁকা খাম।

ফিরতে ফিরতে চোখ পড়ল পারুলদের বাড়ির মাধবীলতা গেটে সেই হারিয়ে যাওয়া প্রজাপতি। এখন প্রজাপতি ধরবার সময় নেই। এখন তাড়াতাড়ি চৌবাচ্চায় গোসল করে খেতে বসা। মা যখনই কোন ব্যাপারে আপত্তি করেন বিপত্তি অনিবার্য– এটা কাজল কেমন করে যেন জেনে গেছে। পান্নাভাইয়ের চিৎকার কানে আসে– ঠাট্টাও বুঝিস না। বৃথাই সারভর্তি মাথা তোর।

কাজল বেছে নিল বাড়ির পেছনের সংৰিপ্ত পথ। যে পথ খুব তাড়াতড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে তাকে। আর চৌবাচ্চার পানিতে গোসল করে বসে যাবে খেতে। দুপুরে পারুল মমতা ঘুমোয়, না হলে বই পড়ে। আর কাজল নানা কাজে ব্যস্ত। এক্কাদোক্কা না হলে মার্বেল। সেসব আজ হবে না। আজ খেয়ে দেয়ে কাজল অনুরোধের আসর শুনবে। 'আকাশ প্রদীপের গান'। কি যে ভাল লাগে সেসব শুনতে। বাড়ির পেছনে একটি লেবুগাছ ছাই গাদায়। সেখানে ধরেছে কয়েকটি লেবু। একটি বড় আর টসটসে। কাজল সে লেবুটা পেড়ে নিল। মাকে দেবে। মা খুশি হবেন। গাছটা কখন যে এতবড় হল কাজল জানে না। এ পথ দিয়ে অনেকদিন সে হাঁটেনি। গাছে লেবুফুল ধরেছে। অসংখ্য ভাঙা হাঁড়িপাতিল ভাঙা পেস্নটের মাঝখানে একটি প্রাণময় লেবুগাছ। কাজল একটু দেখে, তারপর বাড়িতে ঢোকে পেছনের দরজা দিয়ে।

উঠোনে মিঠুপা। রঙ জ্বলে উঠবার আগেই শাড়ি তুলছে। ও বলে– কি ব্যাপার গোসল না সেরে বাড়ি আসছ যে।

বাড়িতে গোসল করব। কাজল বলে।

চৌবাচ্চায় পানি নেই। মিঠুপা বলে।

এখন থেকে আমি বাড়িতে গোসল করব রোজদিন। কাজল গম্ভীর মুখে বলে।

সুমতির কারণ? মিঠুপা শাড়ি হাতে ঘরে যেতে যেতে প্রশ্ন করে। কাজল উত্তর দেয় না। ওর বলতে বয়েই গেছে পান্নাভাইয়ের কথা, তার টিটকিরির কথা। মা লেবু পেয়ে খুশি হলেন। কাজল মাকে বলে– তোমার কথা শুনলাম। মা এরপরে আর কোন প্রশ্ন করেন না।

কাজল কলঘরে ঢোকে। চৌবাচ্চায় তখনও অনেক পানি। রৌদ্রে তেতে ওঠা মুখ ধোয় কাজল। তারপর একটু একটু করে গায়ে পানি ঢালে। কাকগোসল নয়। পরিপূর্ণ গোসল।

মিঠুপা অনেক সাবান খরচ করেছে। মা বলেন, ওর বিয়ে হয়ে যাবে পরীৰার পর। মিঠুপার সেই বাক্সটা কাজল পাবে। কতকিছু যে সে বাক্সে! সব মিঠুপা ওকে দিয়ে দেবে ভাবে কাজল। আর মিঠুপার ঘর ওর হবে। কাজল বোধকরি সেই খুশিতে অনেকসময় ধরে গান করে– সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা। মিঠুপার বাক্সে নানা সব আতর, একশিশি নীল বলু-ইভনিং। ফিতে ও ক্লিপের সম্ভার। চিঠি লেখার কাগজ। পাখি আঁকা খাম। আরো কত কি? আপনমনে বলে ও– এবারে পান্নাভাই দেখা হলে হেজহগ মাথা, কদমফুল, সজারু সব যদি না বলেছি। তবে পান্নাভাই একেবারে মন্দমানুষ নন। মাঝে মাঝে মমতা, পারুল ও কাজলের জগতে একেবারে আনন্দ শিশির। তবে মাঝেমাঝে খুব বিদ্রুপ করে কথা বলা যদিও তার স্বভাব তবু মন্দ নয়। পা ঘসতে ঘসতে বলে– আমি জানি আপনার দুর্বলতা মিঠুপা তাই না? আমি জানি। আমি সব বুঝতে পারি।

ধুলোমাখা শরীর অনেক সাবান মেখে উজ্জ্বল শ্যাম দেখায়।

বারান্দায় টেবিল পেতে খাবারের ব্যবস্থা। কাজল বাদে সবাই বসে গেছে। মা অবশ্য খাওয়াতেই ব্যস্ত। গোসলের এত ঝঞ্ঝাট না হলে কাজলই আগে বসত। যে অনেক আগেই দেখে ফেলেছে আজকের রেসিপি। আব্বা বললেন– এখানে বস। গলা পর্যন্ত সুবাসিত পাউডার। মিষ্টি গন্ধে ছেয়ে যায় চারপাশ। মিঠুপা একটু হেসে খুব জোরে নিশ্বাস টানলেন। ঘরে বানানো ঘি মাখলেন মা পাতে। তারপর প্রথমে খেতে হবে মার 'ভিটামিন ভাজি'। কাজল আপত্তি করলে মার শুনতে বয়েই গেছে। তার মতে তরকারিরর খোসাতে এ থেকে জেড পর্যন্ত ভিটামিন থাকে। আব্বার সারামুখে তৃপ্তি। মা বললেন আর একবার রেবাবুর আসবার কথা। ওদের আসা মানে বেশ কিছু বাড়তি খরচ। সে নিয়ে কেউ ভাবে না। তবু মা আবার বলেন। সব কিছু ছাপিয়ে যে আনন্দ তাতে খরচটরচ নি য়ে কে ভাববে এখন? আর আব্বা এরপরেই বসে যাবেন খাতা খুলে কবিতা লিখতে। তিনি জানেন মা চালাবেন সব ঠিকমত, চালিয়েই নেবেন যেভাবেই হোক। আর সে জেনেই আব্বা সদানন্দ। পাশের বাড়ির মমতার বাবা ডাকেন– ও সদানন্দ মশায়। আর মা বেশি টাকা পেলে কি করে সে সকলেই জানে। হয়তো হবে কাজলের নতুন জামা, মিঠুর শাড়ি না হলে একটি বাহারি সুজনি। নিজের জন্য তেমন কিছু তার দরকার নেই। তিনি নিজের জন্য কিছু চান না। গোটাকয় তোলা আর গোটাকয় নিত্যব্যবহার্য এই তার শাড়ি। সেগুলো মিঠুপা আবার ধার করে পরে। মার মতে সংসারে মেয়েদের দেবার থাকে বেশি। নেবার নয়। মা বলেন প্রায়ই একবার দু'বার করে– কাজল তুই মেয়ে এ কথা ভুলিস না। কাজল ভুলবে কি করে। গোটাকয় আয়না আছে না বাড়িতে।

এতবড় মাছ খেতে পারব না। এই বলে মিঠুপা তুলে রাখেন মাছের আর্দ্ধেক। সদানন্দ আব্বাকে আনন্দিত করতে মা কিছুই খাবেন না হয়তো শেষ পর্যন্ত। তবু আধখানা থাক মার জন্য। মিঠুপার এই ব্যাপার মাকে খুশি করে। মা জানেন এমনি করেই মেয়েদের সকলের জন্য ভাবতে হয়।

দৈ খেলো না মিঠুপা। টনসিলের গোলমাল। কাজল দৈ আর তালগুড়ে হাত মাখামাখি করে সবটুকু ভাত খেয়ে ফেলে। মা চেয়ে দেখেন। এ ভাবে খাওয়া তার পছন্দ নয়। কিন্তু কিছু বলেন না।

আজকে অনুরোধের আসর। মিঠুপা শুনবে না। কি সব কাজে ব্যস্ব। কাজল রেডিওর চাবি ঘোরায়। নানা প্রকার পছন্দের গান বাজে এখন। দৈ তখনো শেষ হয়নি। কাজল চাবি ঘোরাতে থাকে বাঁহা তে। মিঠুপা ঘরে চলে গেছে। আব্বাও নেই। মা খেতে বসে। কাজল লৰ্য করে ওই আর্দ্ধেক কৈ মাছ মা পাতের পাশে রেখেছেন। কাজল কিছু বলে না। সুবীর সেনের গান শুরু হয়েছে।

পানের বাটার ওপর চুন ধরা। তবু বোঝা যায় মার হাতের কাজ। পাখির ছবি সেখানে। আব্বাকে একটি পান বানিয়ে দেয় কাজল।

তারপর গান শোনে। আর বুঝতে পারে বারান্দায় কাজল একা। মা ঘুমোচ্ছেন। আব্বাও হয়তো। মিঠুপা লিখছে। আর কাজল ভাসছে 'আকাশ প্রদীপের আনন্দে'। গান শুনতে শুনতে বারান্দার ইজিচেয়ারে বন্ধ হয় দু'চোখের পাতা। দুপুরের সবটুকু আলো আঁচল গুটিয়ে চলে গেছে। কাজল সেই বেতের ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সালেহা চৌধুরী
প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

Saffola Active

Introducing new 'Saffola Active', blended edible vegetable oil. It brings you the benefits of 2 oils (80% Rice Bran & 20% Soyabean) in one. Saffola Active is more effective for heart than any other ordinary vegetable oil. And it promises you healthy heart and healthy life.

3 Triple Action — Vitamin E, Omega3, Oryzanol

Saffola Active is enriched with **Triple Action Formula** that contains the goodness of Omega 3, Oryzanol and Vitamin E which help to reduce LDL (bad cholesterol) levels.

LOSORB™ TECHNOLOGY

Saffola Active comes with patented **LOSORB technology**. Foods cooked in Saffola Active have lower fats due to lower absorption of oils while cooking.

5 Antioxidant

Saffola Active also has the **goodness of 5 antioxidants** which keeps your heart and life healthy.

So, start using Saffola Active from today and keep your family healthy and always rejuvenized. Available in 1 litre and 5 litres jars.

marico

Healthy Heart
Healthy Life

প্রবন্ধ

পাঠশালা

আহমেদ রিয়াজ

গাধুর খুব মন খারাপ। বাবা ওকে ডানে যেতে বললে বামে যায়। মা বামে যেতে বললে ডানে যায়। কেন যে যায়, নিজেও জানে না। কেবলই উল্টো কাজ করে। গাধুটাকে নিয়ে মায়ের যেমন দুঃখ। বাবারও। বাবা মাকে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি ছোটবেলায় ওর মত ছিলে। তোমাকে ডানে যেতে বললে বামে যেতে।

গাধাও মা-ও কম যায় না। তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, তুমি মনে হয় খুব কথা শুনতে। তুমিও তো ছোটবেলায় বামে যেতে বললে ডানে যেতে। যেতে না?

বাবা গাধা বললেন, কে বলেছে তোমাকে?

মা গাধা বললেন, আমি জানি।

বাবা গাধা বললেন, কেমন করে জানো?

মা গাধা বললেন, আমাদের গাধুটাকে দেখলেই বোঝা যায়। ও ঠিক তোমার মত হয়েছে।

বাবা গাধা একটা কাশি দিয়ে বললেন, সে যাক। নিজেদের ছোটবেলা নিয়ে এই বয়সে এসে ঝগড়াঝাটি করে লাভ নেই। তারচেয়ে আমাদের গাধুটাকে কীভাবে ঠিকঠাক মত চালানো যায়, সেটাই ভাবি।

মা গাধা বললেন, রক্তের ডাক এড়ানো যায় না। ওর রক্তের মধ্যেই মিশে আছে গাধামি। ও গাধাই হবে।

বাবা গাধা বললেন, তোমার কথা ঠিক নয়। শুনেছি ঠিকমত লেখাপড়া করলে নাকি গাধাও ঠিক হয়ে যায়।

মা গাধা অবাক হয়ে বললেন, সত্যি!

বাবা গাধা বললেন, তবে আর বলছি কী! একেবারেই ঠিক কথা।

মা গাধা বললেন, কিন্তু গাধাদের লেখাপড়া করার জায়গা কোথায়? গাধাদের জন্য তো আর স্কুল নেই। আছে?

বাবা গাধা বললেন, নেই কে বলল। আছে। মানুষের স্কুলেই গাধাদের জন্য আলাদা বসার জায়গা আছে।

মা গাধা বললেন, কী যা তা বলছ। মানুষের স্কুলে গাধাদের কি ঢুকতে দেয়?

বাবা গাধা বললেন, দেয়। একদিন আমি নিজের কানেই শুনেছি। এক টিচার তার এক ছাত্রকে চেঁচিয়ে বলছেন গাধা কোথাকার! কাকে গাধা বলেছে টিচার জান?

মা গাধা অবাক হয়ে বললেন, কাকে?

বাবা গাধা বললেন, কাকে বলেছে তা-ও বুঝতে পারনি? আসলেই তুমি একটা গাধি।

ব্যস। ওতেই রেগে গেলেন মা গাধা। আবারও তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, শোন গাধি হয়ে জন্মেছি বলে বারবার মনে করিয়ে দিও না। তুমি গাধা হয়ে জন্মেছ বলেই আমি গাধি হয়ে জন্মেছি। তুমি আর আমি সমান। বুঝেছ?

তুমি নিজেই তো একটা গাধা। আমাদের গাধু তো এজন্যই এখনও গাধা রয়ে গেল।

বাবা গাধা বললেন, তুমিও তো বারবার নিজের দোষ ঢাকার জন্য আমার ছোটবেলা টেনে আনছ। ছোটবেলায় আমরা কে কী ছিলাম সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে আমরা বড় হয়ে কে কী করছি।

মা গাধা বললেন, খুব বড় বড় কথা হচ্ছে। ছোটবেলায় যেমন পিঠের ওপর বোঝা বয়ে বেড়াতে, এখনও তো তা-ই করতে হচ্ছে তোমায়।

বাবা গাধা বললেন, তুমিও তো বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ।

মা গাধা বললেন, গাধা হয়ে জন্মলে এমন বোঝা বয়েই বেড়াতে হবে। ওটাই গাধাদের কাজ।

বাবা গাধা বললেন, কিন্তু আমি চাই না আমাদের গাধুও বোঝা বয়ে বেড়াক। তুমি চাও?

মা গাধা বললেন, আমিও চাই না।

বাবা গাধা বললেন, এ জন্যই তো আমাদের গাধুকে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে চাই। মানুষের স্কুলে।

মা গাধা বললেন, মানুষের স্কুলে কি আমাদের গাধুকে নেবে?

বাবা গাধা বললেন, কেন নেবে না? অবশ্যই নেবে। ওই যে বললাম একদিন আমি এক টিচারকে বলতে শুনেছিলাম গাধা কোথাকার! ওটা কাকে বলেছে জান?

মা গাধা জানতে চাইলেন, কাকে বলেছে?

বাবা গাধা বললেন, একটা গাধাকে বলেছে। কেন বলেছে জান?

মা গাধা আবারও জানতে চাইলেন, কেন বলেছে?

বাবা গাধা বললেন, ওর ঠিকানা জানার জন্য বলেছে। টিচার আসলে জানতে চেয়েছিলেন ও কোন জঙ্গলের গাধা। মনে হয় ওর স্কুলের বেতন বাকি পড়ে গিয়েছিল। স্কুলের বেতন বাকি পড়ে গেলে টিচারদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ঘন ঘন নোটিশ পাঠায় ছাত্রদের বাবা-মার কাছে। অনেক সময় পরীক্ষাও দিতে দেয় না।

মা গাধা বললেন, উঁহ্! তুমি ঠিক কথা বলছ না। টিচাররা এমন হতেই পারেন না। টিচাররা তো আর তোমার-আমার মত গাধা নন।

বাবা বললেন, তুমি আসলেই একটা গাধি। টিচারদের সম্পর্কে তুমি কী জান শুনি? কিছুই জান না।

মা বললেন, তুমি মনে হয় খুব জান!

বাবা গাধা বললেন, জানিই তো।

মা গাধা বললেন, কী কী জান শুনি?

বাবা গাধা বললেন, টিচারদের হাতে একটা লাঠি থাকবে। ইয়া বড়।

মা গাধা অবাক হয়ে বললেন, লাঠি আবার কেন? লাঠি তো শুনেছি পুলিশের হাতে থাকে। চোর-ডাকাত পেটানোর জন্য। ছাত্ররা কি চোর না ডাকাত যে ওদের শায়েস্তা করতে লাঠি লাগবে?

বাবা গাধা বললেন, কী জানি। সেটা জানি না। টিচারদের রকম- সকম বুঝি না।

মা গাধা জানতে চাইলেন, টিচারদের মাথা বুঝি সবসময় গরম থাকে?

বাবা গাধা বললেন, থাকতেই পারে। গাধা গরম্ন ছাগল মানুষ– সবাইকে একসঙ্গে পড়াতে গেলে মাথা তো গরম হতেই পারে।

মা গাধা বললেন, সবাইকে একসঙ্গে পড়ান নাকি টিচাররা?

বাবা গাধা বললেন, পড়ানই তো। আমি নিজের কানেই শুনেছি– এক টিচার বলছেন এই গাধা এদিকে আয়। আবার আরেকজনকে বলছেন, এই গরু তুই পড়া শিখে আসিসনি কেন? অন্য এক ছাত্রকে বলছেন, তুই একটা ছাগল, এটা কী লিখেছিস?

মা গাধা চমকে ওঠলেন। বললেন, বল কী! গাধা গরু ছাগল মানুষ– সবাইকে একসঙ্গে পড়ান? সবার ভাষা তিনি বুঝতে পারেন?

বাবা গাধা বললেন, মনে হয় পারেন। না পারলে সবার সঙ্গে কথা বলেন কী করে?

মা গাধা বললেন, আর কেউ পড়ে না? মানে বাঘ সিংহ শেয়াল সাপ– এরা কেউ পড়তে যায় না?

বাবা গাধা বললেন, মনে হয় ওদের লেখা

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে *ভারত বিচিত্রার* অনলাইন এডিশনের সুবিধা চালু হয়ে গেছে এবং আপনারা অনলাইনে *ভারত বিচিত্রা* পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ফেসবুকে সংযুক্ত হতে পারেন। এই মুহূর্তে পত্রিকাটির নতুন গ্রাহকদের নামঠিকানা অ ন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। *ভারত বিচিত্রার* পুরনো ও নতুন গ্রাহকপাঠক দের অনেকেরই টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ ই-মেইল আইডি আমাদের কাছে নেই। যাঁরা নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক, এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবিলম্বে নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উলেস্নখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখে পাঠান। সবাইকে *ভারত বিচিত্রার* সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই সংশোধিত নতুন তালিকা প্রস্তুতির এ আয়োজন।

ভারত বিচিত্রার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি, এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং একে আরও প্রাঞ্জল রূপ দেওয়াই আমাদের লৰ্য। আপনাদের প্রিয় পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার কপি রেখে এবং ঠিকানা নির্ভুলভাবে লিখে পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ৬ মাসের মধ্যে মুদ্রিত না হলে বুঝতে হবে লেখা অমনোনীত হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের যোগাযোগ লেখকের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

পড়া করার ইচ্ছে নেই। কিংবা টিচাররা ওদের স্কুলে ভর্তি নেন না।

মা গাধা বললেন, তাহলে ভালই হয়েছে। তুমি ভাবো একবার আমাদের গাধু একটা সিংহের পাশে বসে লেখাপড়া করছে!

বাবা গাধা বললেন, সিংহের পাশে বসে লেখাপড়া করলে কী হবে?

মা গাধা বললেন, কী হবে মানে? লেখাপড়া করতে করতে যদি সিংহটার খিদে পেয়ে যায় তখন তো আমাদের গাধুকেই খাবার বানিয়ে খেয়ে ফেলবে।

বাবা গাধা বললেন, তুমি আসলেই একটা গাধি। খিদে পেলে এক ছাত্র কি অন্য ছাত্রকে খেয়ে ফেলে নাকি?

মা গাধা বললেন, সিংহের বেলায় সেটা বলা যায় না। দেখা গেল টিচারকেই গিলে খেয়ে ফেলল। তখন? তখন কে ওদের লেখাপড়া শেখাবে? খিদে পেলে সিংহদের কি হুঁশ থাকে?

বাবা গাধা এবার কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, তাহলে তো মানুষের স্কুলে আমাদের গাধুকে ভর্তি করানোয় বেশ বিপদ আছে দেখছি।

মা গাধা বললেন, মানুষের স্কুলে ছাড়া আর কোন স্কুল নেই?

বাবা গাধার তখনই মনে পড়ল একটা স্কুলের কথা। আর মনে পড়তেই চার পায়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন, পেয়েছি!

মা গাধা বললেন, কী পেয়েছ?

বাবা গাধা বললেন, খড় পেয়েছি।

মা গাধা কিছুই বুঝতে পারলেন না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বাবা গাধার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় হাঁ বন্ধ করে বললেন, খড় দিয়ে কী হবে?

বাবা গাধা বললেন, ওটা তুমি বুঝবে না। আমি এখনই আমাদের গাধুর স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করছি।

বলেই আর দেরি করলেন না বাবা গাধা। চারপায়ে ছুটতে লাগলেন। বনের ঠিক মাঝামাঝি শেয়াল পণ্ডিতের একটা পাঠশালা আছে। ওখানে বনের পশুরা লেখাপড়া শিখতে যায়। ওখানেই গাধুকে ভর্তি করিয়ে দেবেন।

দুই.

পণ্ডিত শেয়ালের পাঠশালা। বনের নানান পশুরা লেখাপড়া শিখতে এসেছে এখানে। সজারু সাপ গণ্ডার জিরাফ উলুক, বানর– সবাই। একটু পর গাধুও হাজির হল।

গাধুকে দেখে পণ্ডিত শেয়াল জানতে চাইলেন, এসেছিস তাহলে? তোর ভর্তির দরখাস্ত পেয়েছি।

তারপর একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, ওই ওখানে গিয়ে বস।

গাধু বসতে বসতে পাঠশালার দিকে নজর বোলালো। আটচালার একটা ঘরকেই পাঠশালা বানিয়েছেন শেয়াল পণ্ডিত। ঘরটা খড়ের তৈরি। বনের মধ্যে ইট-বালু সিমেন্টের ঘর পাবে কোথায় ওরা? ঘরের মেঝেটাও খড় দিয়ে বিছানো। খড়ের ওপরই বসে পড়ল গাধু। মেঝেতে বিছানো খড়ের দিকে তাকিয়ে চোখদুটো চক চক করে ওঠল গাধুর। আহ! কী সুন্দর খড়। এমন খড় দেখলে কেবল চিবোতেই ইচ্ছে করে। আনমনে দুটো খড় তুলে মুখেও পুরে দিল ও।

গাধু ভেবেছিল পণ্ডিত মশাই হয়তো দেখেনি। কিন্তু পণ্ডিত বলে কথা! আর সে পণ্ডিত যদি শেয়াল হয় তাহলে তো কথাই নেই তার চোখ ফাঁকি দেয় কার সাধ্যি? গাধুকে খড় চিবোতে ঠিকই দেখে ফেলেছেন পণ্ডিত শেয়াল। আর দেখেই খেঁকিয়ে ওঠলেন, খড় খাস তো?

গাধু বলল, জ্বি স্যার খাই।

পণ্ডিত শেয়াল বললেন, তাহলে তো বড় চিন্তার কথা। নাহ্! তোকে তো এই স্কুলে রাখা যাবে না।

গাধুরও কিন্তু খুব ইচ্ছে লেখাপড়া শিখবে। বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল করবে। এর মধ্যেই ওরা বাবা-মা বনের সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে– আমাদের গাধু লেখাপড়া শিখতে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ও ঠিক প্রথম হবে। কিন্তু টিচার শেয়াল যদি ওকে স্কুলে না রাখেন তাহলে ও প্রথম হবে কেমন করে?

গাধু জানতে চাইল, কেন স্যার?

পণ্ডিত শেয়াল বললেন, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তোরা গাধারা খড় খাস। তোর মুখে দুটো খড়ের টুকরো আটকে আছে। আমি তোকে বরখাস্ত করলাম। তোর আর স্কুলে আসার দরকার নেই।

গাধু আবারও জানতে চাইল, কেন স্যার?

পণ্ডিত শেয়াল বললেন, কেন আবার? পড়তে এসে শেষে আমার পাঠশালাটাই গিলে খাবি। তারচেয়ে ঘরে ফিরে যা। যেদিন খড় খাওয়া ভুলতে পারবি, সেদিন থেকে স্কুলে আসবি।

গাধু আর কী করে। পাঠশালা থেকে বেরিয়ে এল।

তারপর?

তারপর কী হল সেটা আর বলা যাবে না। কারণ সুকুমার বড়ুয়া এ পর্যন্তই লিখেছেন। কী লিখেছেন সুকুমার বড়ুয়া?

নেপাল খুড়োর আটচালায়
শেয়াল গুরুর পাঠশালায়
গাধায় দিলো দরখাস্ত
খড় বিছানো মেঝের পরে
শেয়াল বসে তারস্বরে
প্রশ্ন করেন : খড় খাস তো?
থাকরে বাবা পড়তে এসে
পাঠশালাটাই গিলবি শেষে
করছি তোকে বরখাস্ত।

কাজেই এরপর কী হল সেটা যদি সুকুমার বড়ুয়ার 'পাঠশালা' নামের ছড়ায় না থাকে, এই 'পাঠশালা' নামের গল্পটায় কেমন করে থাকবে? কারণ গল্পটা তো সুকুমার বড়ুয়ার 'পাঠশালা' নামের ছড়া থেকেই লেখা হয়েছে।

আহমেদ রিয়াজ
সাংবাদিক, শিশুসাহিত্যিক

বাংলাদেশভারত মৈত্রী সমিতি
হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India
ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

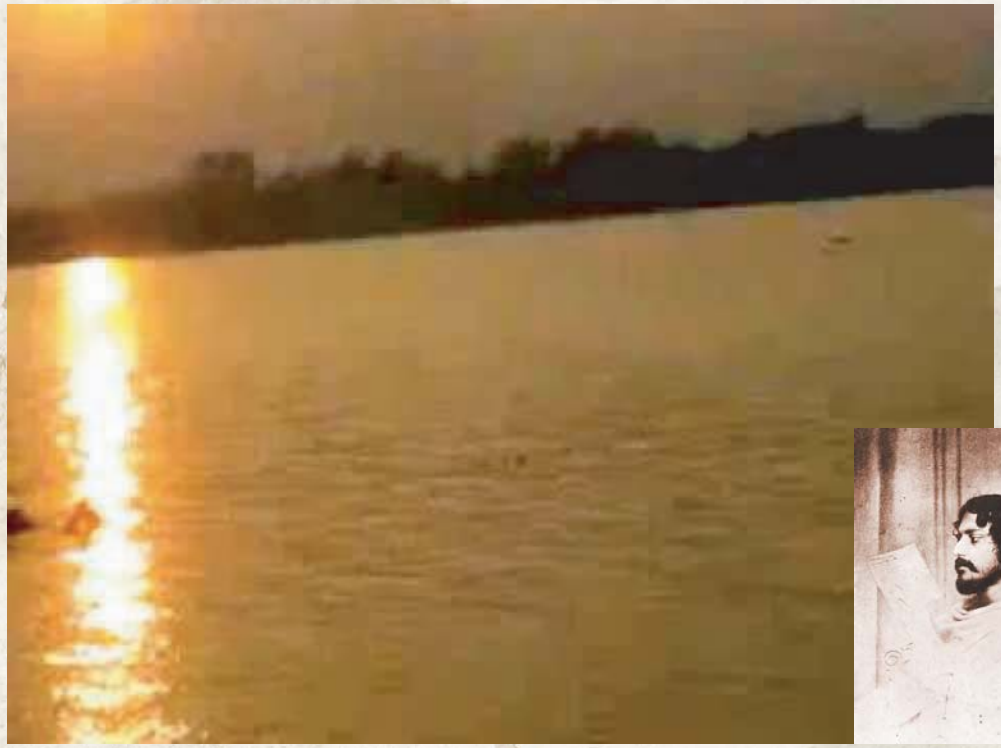

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’

ড. অমৃতলাল বালা

একটি কবিতা কীভাবে একজন কবির প্রতিভাকে নবতর চেতনায় বিকশিত করে পুরো জীবনকে আলোড়িত করতে পারে, বৈশ্বিকভাবনায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত। বিশ্বকবি আর বিদ্রোহীকবির মধ্যে কি অদ্ভুত মিল! দু’জনেরই বয়স তখন বাইশ, কবিতা দু’টি রচিত হয়েছিল জীবনের বিশেষ মুহূর্তে। কলকাতায় খুব কাছাকাছি কবিতা দু’টির জন্ম; উভয়ের নতুন জন্মলাভ। একটি সদরস্ট্রিটে, অন্যটি তালতলায়। উভয় কবিতার মূলসুর বিদ্রোহব্যঞ্জনার অনুরণন। সারা জীবনের সাহিত্যসাধনাগত এষণা। বাংলা সাহিত্যে এ দু’জন কবির মত স্রষ্টা আর সৃষ্টির এমন অভূতপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত তেমন দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটি *প্রভাতসঙ্গীত* কাব্যের অন্তর্গত। এর আগে *শৈশবসঙ্গীত* ও *সন্ধ্যাসঙ্গীত* কাব্য দু’টি প্রকাশিত হয়। কবি সম্ভবত লিরিকের অনুবাদ ‘সঙ্গীত’ করেছিলেন। বিজ্ঞাপনে কবি লেখেন, ‘*প্রভাতসঙ্গীত* প্রকাশিত হইল। ‘অভিমানিনী নির্ঝরিণী’ নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ রচিত হইলে পর আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাহারই প্রসঙ্গক্রমে ‘অভিমানিনী নির্ঝরিণী’ রচনা করেন। উভয় কবিতাই একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম। *প্রভাতসঙ্গীত* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে (মে ১৮৮৩)। গ্রন্থখানি উপহার দেন ‘শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রাণাধিকা’সুকে। ইন্দিরা দেবীর বয়স তখন

মাত্র দশ। ভারতীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার সঙ্গে অন্বয় চৌধুরীর 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' মুদ্রিত হয়। প্রভাতসঙ্গীতএর প্রথম সংস্করণে (বৈশাখ ১২৯০) দু'টি কবিতাই একত্রে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি শুনে অক্ষয় চৌধুরীর মনে যে ভাবোদয় হয়, এ কবিতাটি তারই প্রকাশ। সেজন্য কবিতাটি প্রভাতসঙ্গীতএ মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হয়।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি রচনার একটি ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতা জাদুঘরের কাছে দশ নম্বর সদর স্ট্রিটের একটি বাড়িতে থাকতেন। এখানে অবস্থানকালে 'একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে' কবিতাটি লিখেছিলেন কবি। একদিন এক অভূতপূর্ব আনন্দআ বেগ কবির জীবনে এক নতুন সুর এনে দেয়। এ অভূতপূর্ব নতুন সুর সম্পর্কে তিরিশ বছর পর *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে কবি লিখেছেন: 'সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রীই স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটি বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।... শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম'। (রবীন্দ্র রচনাবলী, জীবনস্মৃতি, ৯ম খ-, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪৯২)

দুই.

প্রকৃতপক্ষে নবীন বয়সে কবিতাটি রচনার পর থেকে পরবর্তী সমস্ত জীবনের কাব্য এই চেতনা থেকেই রচিত হয়েছে। *জীবনস্মৃতির* পাণ্ডুলিপিতে কবি লিখেছিলেন, 'আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিলাম।... একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়ানুভূতির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতাই আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন, '*প্রভাতসঙ্গীত* আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহুর্মুখী উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার বাধাব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে একরকম ভালবাসি– কিন্তু সে এরকম উদ্দামভাবে নয়– আমার ভালবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে সেই দীপ্তিতে এক এক সময় পৃথিবীটা ভারি সুন্দর এবং ভারি আপনার বোধ হয়।' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার যে বিশ্লেষণ এ পত্রে পাওয়া গেল তার মধ্যে কোন অলৌকিক অনুভূতিতত্ত্বের কথা নেই। পত্রটি লেখার প্রায় বিশ বছর পর *জীবনস্মৃতি* মন্থনকালে এ ঘটনার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আবিষ্কার করেছিলেন; এবং আরো বিশ বছর পর 'মানবসত্য' প্রবন্ধে *প্রভাতসঙ্গীত*এর ব্যাখ্যান করেন আরো গভীর এবং ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত থেকে। এ সব উক্তি কবির নিজের জীবনদর্শন সম্পর্কে মতবাদ। কবিতাটির জন্মমুহূর্তে কবিহৃদয়ে কী প্রেরণা ছিল, পরবর্তীকালের ব্যাখ্যাবি শ্লেষণ থেকে জানা যায়। *প্রভাতসঙ্গীত*এর উক্ত কবিতা দু'টির মধ্যে ধর্মের যে আজন্ম সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় তাকে কবি উত্তরকালে 'মানুষের ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করেন। পৃথিবীর মধ্যে মানুষই জীবশ্রেষ্ঠ, মানুষই বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। তাই সেদিনকার অনভূতি মানুষকে আশ্রয় করে সার্থক হয়েছিল; যে মানুষ নাম্নবর্ণ, গোত্রাদির দ্বারা, বহুবিচিত্র সংস্কার দ্বারা আবৃত– সহজ মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তিন.

ধারণা করা যায় রবীন্দ্রনাথের নতুন্নবউঠান কাদ ম্বরী দেবী সদর স্ট্রিটে ও দার্জিলিঙে *প্রভাতসঙ্গীতে*র অনেকগুলি কবিতা লেখার সময়ে কবির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'জীবনের ধ্রুবতারা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনার সময়েও সদর স্ট্রিটের বাড়িতে কাদম্বরী দেবী কবির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ছিলেন। উভয়েই তখন কালাজ্বরে ভুগছিলেন। হঠাৎ একদিন ভোরে জ্বর ছিল না শরীরে রবীন্দ্রনাথের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যস *প্রথম আলো*র প্রথম পর্বে লিখেছেন: 'পরদিন রবির ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। চোখ মেলার পরই মনে হল, আজ জ্বর আছে, না নেই, নিজের কপালে হাত রেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শরীরে কোনও গ্লানি নেই, একটা যেন আবেগ জড়ানো। পালঙ্ক থেকে নেমে রবি সেই ঘুমের রেশ লাগা চোখেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। পৃথিবীরও এখনও ঘুম ভাঙেনি। এদিকের রাস্ত্বায় ফেরিওয়ালা, গোয়ালাও বিশেষ দেখা যায় না। ঊষার আলো প্রথমে শেষ হালকা নীল বর্ণ, তারপর একটু একটু করে লাগছে রক্তিম আভা।

সদর স্ট্রিট যেখানে শেষ হয়েছে, সেই ফ্রি স্কুলের বাগানে গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে হিরন্ময় আলোয় ধোওয়া নতুন সূর্যকে। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রবির চোখের ওপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। এই যবনিকার অন্তরালে শুধু আনন্দ ও সৌন্দর্যের তরঙ্গ। এত দিনের চেনা বিশ্বের বদলে উদ্ভাসিত হল এক নতুন বিশ্ব। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বিচ্ছুরিত হল তার রশ্মি, মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সব বিপদ। ঠিক যেন দৈব দর্শনের মতন নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রবি। শিহরিত হয়ে আছে সমস্ত রোমকূপ। সে শুনতে পাচ্ছে একটা করকর শব্দ। যেন এই মাত্র কোথাও কঠিন পাথর ফাটিয়ে বেরিয়ে এল একটা ঝর্না। সেই নবীন জলধারার শব্দ তার নাম ধরে ডাকছে।

বাসি মুখেই রবি লিখতে বসে গেল।

সে বুঝতে পারছে, আজ সে কবিতা রচনা করছে না আজ কবিতা স্বতোৎসারা ভাষার জন্য চিন্তা করতে হচ্ছে না। চিন্তাই বেরিয়ে আসছে নিজস্ব ভাষায়। কয়েক লাইন লিখে বার বার পড়ছে রবি, নিজেই বিস্মিত হয়ে ভাবছে, এ কার লেখা! আজ প্রত্যুষে কি তার নবজন্ম হল?

সারাদিন ধরে লিখে গেল রবি। মাঝে কাদম্বরী তার ঘরে এসে কয়েকবার উঁকি দিয়ে গেছেন, রবি লক্ষ্য করেনি। সে আজ খেতে যায়নি, প্লেটে করে কিছু ফল মিষ্টি কেউ রেখে গেছে তার সামনে, সে তার থেকে খেয়েছে সামান্যই। সে কয়েক লাইন লিখছে, খাচ্ছে, বারবার পাঠ করছে সেই লাইনগুলো, আবার লিখছে।

বিকেলের দিকে কাদম্বরী গা ধুয়ে সাজগোজ করে এসে মৃদুস্বরে ডাকলেন তাকে। রবি সাড়া দিল না।

কাদম্বরী কাছে এসে বললেন, এত কী লিখছ? এবার ওঠো। শরীর খারাপ হবে যে।

রবি অন্যমনস্কভাবে বলল, না।

কাদম্বরী রাগ করে বললেন, রবি, এবার আমি তোমার খাতা কেড়ে নেব কিন্তু।

রবি ফিরেও তাকাল না, কিছু বললও না।

কাদম্বরী এবারে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে রবির লেখার খাতা আঁকিবুকি কেটে দিলেন।

রবি বলল, আহ্ কী হচ্ছে ?

কাদম্বরী বললেন, রবি, তুমি সারাদিন মাথা গুঁজে পড়ে থাকবে, এটা আমার মোটেও ভালো লাগছে না। তুমি ওঠো। না হলে সব লেখা কাটাকুটি করে দেব বলছি।

রবি কয়েকবার মাথা ঝাঁকুনি দিল। তারপর উঠে বসে বলল, নতুন বউঠান, কী লিখেছি, শুনবে? এটার নাম নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

কাদম্বরী বললেন, হ্যাঁ, শোনাও। তারপর তুমি স্নান করে পোশাক বদলাবে।

আমরা আজও ছাতে গিয়ে বসব।

রবি পড়ল, প্রথম চার লাইন।

আজি এ প্রভাতে প্রভাত্নবিহ গে

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ হয় আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন না, তিনি কিছু হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন’।

কী গান গাইল রে!
অতি দূর দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইলরে।

এটুকু পরেই, মুখ তুলে তাকিয়ে রবি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

কাদম্বরী ঈষৎ ভুরুন্ন কোঁচকালেন। ধীরে মাথা দুলিয়ে বললেন, তেমন ভাল লাগছে না তো। ‘ভাসিয়া আইল রে’ এটা কেমন যেন। রবির বুকে যেন একটা শেল বিঁধল। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে শোনাতে শুরু করেছিল। তার দৃঢ় ধারণা, এ কবিতা একেবারে অন্য রকম। তার নবজন্মের কবিতা।

সে ফ্যাকাশে গলায় বলল, তোমার ভালো লাগছে না? নতুন বোঠান, এ কবিতা আমি চেষ্টা করে লিখছি না। আপনা আপনি বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে।

কাদম্বরী নিচু গলায় বললেন, আপনা আপনি বেরিয়ে এলেই কি ভালো কবিতা হয়? কবিতা তো একটা নির্মাণের ব্যাপার, তাই না? আমি অবশ্য বিশেষ কিছুই বুঝি না।

রবি গম্ভীর হয়ে আবার পড়তে শুরুন্ন করল:

না জানি কেমনে পশিলে হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ...

রবি আবার মুখে তুলল।

কাদম্বরী অপরাধীর মতন মুখ করে বললেন, কী জানি, আমি এতে নতুনত্ব কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো আমার বোঝার ভুল–

রবির মাথায় রাগ চড়ে গেল। কাদম্বরীর দিকে সে এমন রক্তচক্ষে কখনও তাকায়নি। তার মনে হল, এ রমণী কিছুই কবিতা বোঝে না। একে আর শুনিয়ে কী হবে? নাঃ, আর কোনওদিন সে নতুন বউঠানকে তার কবিতা শোনাবে না।

কাদম্বরী ঝুঁকে রবির গা ছুঁয়ে মিনতি করে বললেন, রবি, তুমি রাগ করছ? আর একটু পড়ো–

রবি এবার অনেকটা বাদ দিয়ে চিৎকার করে পড়তে লাগল :

আজি এ প্রভাত রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পর
জাগিয়া উঠিল প্রাণ ...

কাদম্বরী বললেন, বাঃ, এই জায়গাটা ভালো লাগছে। সত্যি বেশ ভালো লাগছে।

রবি পড়ে যেতে লাগল প্রায় গর্জনের স্বরে:

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি
ওরে প্রাণের বসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে...

কাদম্বরী রীতিমতন ভয় পেয়ে রবির একটা হাত চেপে ধরে আর্ত গলায় বলে উঠলেন, রবি, রবি, থামো তোমার আজ কী হয়েছে, রবি?

রবি থেমে গেল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। থমথমে মুখ, উষ্ণ শ্বাস। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, নতুন বউঠান, আজ আমার ঘোর লেগেছে। কিসের ঘোর তা জানি না। আমি যেন আর আমাতে নেই।...’

চার.

রবীন্দ্রনাথ ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটিকে জীবনে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ‘আমি সেই দিন সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ লিখিলাম। একটি অপূর্ব (অভূতপূর্ব) অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।’ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে এ এক বিরাট পরিবর্তন। *সন্ধ্যাসঙ্গীত*পর্বে হৃদয়াবেগের গদগদভাষী আন্দোলনের পর *প্রভাতসঙ্গীত* পর্বে যে মননের রূপ ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিল, সেই সময়েই তার সূচনা। এর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জগতকে দর্শকের মত দেখতে চেষ্টা করতেন। তাই সদর স্ট্রিটের বাড়ির অভিজ্ঞতাকে আকস্মিক মনে না করে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার পরিণতি হিসেবে দেখাই সঙ্গত। আমাদের ধারণা, জোড়াসাঁকোর অভিজ্ঞতার পরই *সন্ধ্যাসংগীত* কাব্যের প্রথম ‘উপহার’ কবিতাটি (‘সন্ধ্যা’– ‘অয়ি সন্ধ্যে,/ অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী’) ও ‘আমি হারা’ কবিতা দুটি লেখা, দুটির মধ্যেই কিছুটা আত্মসমীক্ষার সুর শুনতে পাওয়া যায়। এর পর সদর স্ট্রিটের বাড়ির অভিজ্ঞতা কাব্যরমা লাভ করে ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতার মধ্যে– যাকে তিনি পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা বলে উল্লেখ করেছেন।

পাঁচ.

‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’এর সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতার পর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ‘আত্মহারা আনন্দের অবস্থায় ছিলেন। এরপর তিনি দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নতুন বউঠানের সঙ্গে দার্জিলিং যান। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, সদর স্ট্রিটের শহরের ভিড়ের মধ্যে যা দেখেছিলেন হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাই আরও ভাল করে গভীর করে দেখতে পাবেন। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় নিজেকে কিভাবে প্রকাশ করে তা জানা যাবে। কিন্তু হিমালয়ে গিয়ে দেখা গেল সেই দৃষ্টিই হারিয়ে গেছে। *জীবনস্মৃতি*তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ হয় আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন না, তিনি কিছু হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন’। এখানে রবীন্দ্রনাথ সদর স্ট্রীটে ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ রচনার কথা বলতে চেয়েছেন।

‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ লেখার সময় কাদম্বরী দেবী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করে বউঠানকে পড়ে শোনাতেন। এটিও পড়ে শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, ‘নতুন বউঠান এ কবিতা আমি চেষ্টা করে লিখছি না। আপনা আপনি বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে।’ তখন কাদম্বরী দেবী বললেন, ‘আপনা আপনি বেরিয়ে এসে কি ভালো কবিতা হয়? কবিতা তো একটা নির্মাণের ব্যাপার, তাই না? কাদম্বরী দেবী যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন এভাবে নির্দেশ্নউপ দেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘জীবনের ধ্রুবতারা’ বলে সম্বোধন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান কবিখ্যাতির মূলে এই বিদূষী মহিলার অবদান অনস্বীকার্য। আলোচ্য কবিতাটিতেও তার ব্যত্যয় হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সারাজীবন ও সাহিত্যকর্মের ভূমিকাস্বরূপ।

ড. অমৃতলাল বালা
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

অনুবাদ গল্প

ছেঁড়া চাদর

বোম্মিরেড্ডি পলি-সূর্য রাও

গাঁ-টা যেন অন্ধকারে ছেঁড়া চাদরে মুড়ি দিল। তার ছিদ্র দিয়ে প্রদীপের আলো টিম্‌টিম্‌ করতে থাকে। ন'টাও তখন বাজেনি, সারা গাঁ নিঝুম, নিস্তব্ধ। এদিকে ওদিকে দু'চার জন রোয়াকে বসে তামাক খেতে খেতে গল্প করছে। চুরুটের আগুন ঠিক জোনাকির মত টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে।

কুঁড়েঘরের সামনে উঠোনের রোয়াকে বসে বৈরাগী রামস্বামী একতারাটা নিয়ে ভক্ত রামদাসের গান ধরেছে। বৈরাগীর গলা ভয়ঙ্কর কিন্তু রামদাসের গীত গাইছিল বলে পাড়াপড়শী আর কোন আপত্তি করেনি। গাঁয়ের লোকেরা রাতে কুকুরের 'ঘেউ' ঘেউ' আর তার সঙ্গে এই গান শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ভাগ্নে সত্যম্‌ রাতের খাওয়া সেরে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাইরে বেরিয়ে আসে।

'কি মামা, রোয়াকে মাদুর বিছিয়ে হ্যারিকেনটা কি রেখে দেব?' এই বলে সে বৈরাগীর গান গাওয়ায় বাধ সাধে। বৈরাগী একতারাটা নামিয়ে রেখে রেগেমেগে বলে ওঠে, 'রেখে দে-না! এক কথা রোজ জিজ্ঞেস করার কি আছে?'

'আসলে বাপারটা কি জানো, মামা! কালেক্টারের চাপরাসী বলছিল, গত দু'দিন ধরে পুলিশের কড়াকড়ি বড্ড বেড়েছে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

মেয়ে এখন বড় হয়েছে। কিন্তু বৈরাগী ভাবে সে এখনও তেমনি ছোট। বৈরাগী মেয়ের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নেয় না। ভাল ঘরে পড়লে ওর জীবনটা সুখে কাটবে, বৈরাগীরও আর রোজগারের চিন্তা করতে হবে না। বাকি দিনক'টা ভগবানের নাম জপ করতে করতে কাটিয়ে দেবে। গৌরম্মা বাপের মনের ভাব বুঝতে পারে। তাই আর কিছু বলে না।

'ঐ এক আচ্ছা হতভাগা জুটেছে তোর। ও নিজেকেও কালেক্টার মনে করে। আরে সত্যম্, আমাকে পুলিশের কথা কি শোনাচ্ছিস! আমি কি কিছু জানি না? ছ'বার জেল ঘুরে এসেছি। ওরা এ রকমই মিছিমিছি গুজব রটায় আর লোকেদের ভয় দেখায়। ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছু নয়।'

মামার সব কীর্তিই সত্যম্ জানে। সময় অসময় বৈরাগী নিজের আত্মকাহিনি বেশ গর্বের সঙ্গে সত্যম্‌কে শোনায়। বৈরাগী লিখতে জানে না তাই, নয়তো নিজেই আত্মকাহিনি লিখে ফেলত।

আত্মবিশ্বাস আর অহঙ্কার রামুর জন্মগত। ছোটবেলা থেকেই শরীরচর্চা করত। তাই যৌবনে পা দেওয়ার আগেই তার দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মাংশপেশীগুলো নিটোল, যেন ঠিক ঘোড়ার মত। চব্বিশ ঘণ্টা শরীরচর্চা নিয়েই মেতে থাকত। কোনদিনই পরিশ্রমের কাজ করার কথা চিন্তাও করেনি। যে মেয়েটাকে ও বিয়ে করতে চাইল, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকেই বিয়ে করল। শ্বশুরবাড়িকেই নিজের ঘর করে নিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর অনেক বলা-কওয়াতে শেষে নাচার হয়ে কখনও তাস খেলে কিংবা কখনও পকেট মেরে সে বাড়িতে দু'চার পয়সা রোজগার করে নিয়ে আসত। একবার ধরা পড়ে ছ'মাস জেল খাটে। জেল খেটে বাড়ি ফেরার আগেই তার স্ত্রী এক কন্যার জন্ম দিয়ে মারা যায়। মেয়ের খাওয়া-পরার টাকা সে চুরি করে জোগাড় করত। এইভাবে নানা গাঁ ঘুরে জেল খেটে পনেরোটা বছর সে বাড়ির বাইরে কাটিয়ে দেয়। পনেরো বছর পরে বাড়ি ফিরে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ী গত। মেয়ের দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব এখন তার। মেয়ে বড় হয়েছে, একা ঘরে রেখে বাইরে যাওয়া মুশকিল। গাঁয়ে তাই একটা কুঁড়ে বানিয়ে সে বাস করতে লাগল। এখন বয়স হয়েছে, শরীরও ভেঙে পড়েছে। অতীতের ওপর অনেক বিতৃষ্ণা, তাই নতুনভাবে জীবন শুরু করে। গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হল। একতারাটা এখন তার একমাত্তর সাথী। রামু এখন রামস্বামী। কিন্তু পেট চলবে কি করে? বাড়িতে এক ভাগ্নে আছে, সেও এক নম্বরের কুঁড়ে; একটা পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই। বাড়ির উঠোনে বসে যারা তাস পিটোয় তাদের জন্যে মাদুর আর আলোর ব্যবস্থা করে দিয়ে সামান্য কিছু ভাড়া আদায় করে। মাদুর পাতা, আলো জ্বালানো আর বাইরে দাঁড়িয়ে পুলিশ আসতে দেখলে ভেতরে খবর পাঠানো– এই হল ভাগ্নের ডিউটি। খবর পেলেই বৈরাগী আলোটা নিভিয়ে দেয় আর সবাই যে যার বাড়ির পথ ধরে।

ভাগ্নে একেবারে মামার নকল। বাঁধা বলিষ্ঠ শরীর, কোঁকড়ান চুলে তাকে বেশ সুন্দর দেখায়। মামার চেয়ে বেশি সমঝদার, লেখাপড়াও জানে। শুধু যা কোমর বেঁধে কাজ করতে পারে না। বৈরাগীর ভাগ্নের ওপর তাই রাগ।

বৈরাগীর মেয়ে গৌরম্মা ঘর থেকে ছিলিম আর তামাক নিয়ে আসে। বৈরাগী ছিলিম সেজে আগুন লাগাতে লাগাতে বলে, 'মা! আজ তোর মামার চিঠি এসেছে। লিখেছে ওর ছেলের মুন্সেফ কোর্টে চাপরাসীর একটা চাকরি হয়ে গেছে।'

গৌরম্মা সত্যমের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। গৌরম্মাকে হাসতে দেখে সত্যমের সারাদেহে পুলক জাগে। গৌরম্মার রূপ অন্ধকারেও প্রদীপের মত জ্বলজ্বল করে। তার অপরূপ রূপের মায়ায় সবাই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। গৌরম্মার হাসির কারণ শুধু সত্যম্‌ই জানে। গৌরম্মা সত্যম্‌কে দিয়ে লুকিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে নিয়েছে। মামার ইচ্ছে গৌরম্মার বিয়ে তার ছেলের সঙ্গে হোক। বৈরাগীরও তাই ইচ্ছে।

'একটু যা মুশকিল। ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়ে গেলে আমি একলা হয়ে যাব, তা না হলে আমাকেও তোর সঙ্গে ওখানে যেতে হবে।' বৈরাগীর মনে এই সব তোলপাড় হতে থাকে। আর সত্যি বলতে কি বৈরাগী মেয়েকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। মেয়েকে ও বড্ড ভালবাসে।

'ঠিক আছে, তাই হবে। এত ভাল ঘর পরে আর পাওয়া যাবে না। এখানকার বাঁধন ছিঁড়ে ঐখানেই গিয়ে থাকবে।' বৈরাগী মনোস্থির করে ফেলে।

'থাক-না বাবা, এত তাড়াই-বা কিসের?' গৌরম্মা বলে।

'তাড়া করব না কেন মা?'

'আমি ওকে বিয়ে করব না বাবা! একেবারে কসাইয়ের প্রাণ ওর, না আছে মন প্রাণ, না আছে দয়ামায়া।'

'তুই কি বলছিস মা! তাই তো সে মাসে একশো টাকা রোজগার করে। মাইনে বাদে উপরিও আছে। দয়ালু আর দিলদরিয়া লোক এক পয়সাও রোজগার করতে পারে না পাগলী। মন বস্তুটা আমার মত বৈরাগীর থাকে, যে রোজগার করে তার নয়। কিন্তু মা এ সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। তাছাড় আমি কথাও দিয়েছি।'

মেয়ে এখন বড় হয়েছে। কিন্তু বৈরাগী ভাবে সে এখনও তেমনি ছোট। বৈরাগী মেয়ের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নেয় না। ভাল ঘরে পড়লে ওর জীবনটা সুখে কাটবে, বৈরাগীরও আর রোজগারের চিন্তা করতে হবে না। বাকি দিনক'টা ভগবানের নাম জপ করতে করতে কাটিয়ে দেবে। গৌরম্মা বাপের মনের ভাব বুঝতে পারে। তাই আর কিছু বলে না।

সত্যম্ বৈরাগীকে রোয়াকে ডেকে আনে। বাইরের রোয়াকে তখন জনাদশেক লোক বসে। এক কোণে হ্যারিকেন জ্বলছিল। একজন তাসগুলো ঠিক করছিল; বৈরাগী এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়।

'কি বৈরাগী, হ্যারিকেনটা টিম্‌টিম্ করছে কেন? তেল নেই বুঝি?'

'তেল থাকবে না কেন? এই মাত্তর চার আনার তেল কিনে ওটায় ঢালা হয়েছে। হাওয়ার জন্যে এই রকম হচ্ছে। বৃষ্টিও হতে পারে মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করুন।

'বৃষ্টি এলেই-বা কি? খেলার কোন অসুবিধে হবে না। পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচা যাবে।'

'ভাল কথা। শ্রীরামচন্দ্রের নাম করে খেলা শুরু করুন, নিশ্চয়ই জিতবেন। কিন্তু এক বাজী খেলা শেষ হলেই যে দল জিতবে তারা আমাকে টাকায় এক আনা করে ভাড়া দেবে। সকলে যে যার ভাড়া দিয়ে যাবে ভেবে কাল আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এক টাকা লোকসান হয়ে গেল।'

'আহা, বেচারার লোকসান হয়ে গেছে? বৈরাগী! মাত্তর একটিবার তোমার মুখ থেকে আমরা সত্যি কথা শুনতে চাই। খেলাটা বেশ যখন জমে ওঠে তুমি তখন 'পুলিশ' 'পুলিশ' রব

তুলে বাতিটা নিভিয়ে দাও। আর এই হট্টগোলের মাঝে আমাদের পয়সাও গায়েব কর। এ রকম ক'বার করেছ সত্যি করে বল।'

'রাম! রাম! এত নীচ কাজ আমি কখনও করিনি। কে জানে, অন্ধকারে কে কার পয়সা মেরে নেয়? আমি বৈরাগী মানুষ, পয়সায় আমার কি হবে?'

'ঠিক আছে ভাই, তুমি ঠিকই বলছ। হাত জোড় করে তাই তোমায় বলছি যে তুমি এখানে থেকো না। যদি চাও তো তোমার ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দাও। তুমি বরঞ্চ একতারা বাজাও।'

'ঠিক আছে। সবাই সৎ হলে কারুরই আর দরকার হয় না। ভাড়ার পয়সা আলাদা রেখে দিও।'

'ন্যায্য যাও পাওনা, সেটা তুমি নিয়ে নিও। আমরা না করব না। কিন্তু খেলার মধ্যে পুলিশের ভয় দেখিয়ে আলো নিভিয়ে পয়সা লুট করলে আগেই বলে দিচ্ছি পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব।' এক তাসের জুয়াড়ী বৈরাগীকে সাবধান করে দেয়।

খেলা শুরু হয়। আরম্ভ হয়েই খেলাটা বেশ জমে ওঠে।

খেলা দেখে দেখতে বৈরাগী ওখানেই বসে পড়ে।

বাইরে রাস্তায় সত্যম্ আর গৌরম্মা কথা বলছে।

'আরে পাগলী! তুই এত উতলা হয়ে পড়ছিস কেন? দু'তিন দিনের মধ্যেই তোর বাবার রাগ পড়ে যাবে। তারপর আবার এখানেই ফিরে আসব। মাড়ওয়ারী আমার কথা খুব শোনে। যখন বলব তখনই চাকরি দিয়ে দেবে। আরাম করে থাকব।' সত্যম্ বলে চলে।

বৈরাগী দেখে বাইরে গৌরম্মার সঙ্গে তার ভাগ্নে কথা বলছে। উঠে গিয়ে ভাগ্নেকে সে বারান্দায় পাঠিয়ে দিল। মেয়েকে ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়তে বলে; রাস্তার ধারে রোয়াকে বসে নিজে ছিলিম টানতে থাকে।

বৈরাগী মেয়ের বিয়ের কথাই ভাবছিল। বিয়ের জন্যে পাঁচশো টাকা জোগাড় করে রেখেছে। গয়নাগাঁটি বাবদ দুশো টাকা আলাদা করে রাখা আছে। বৈরাগীর ইচ্ছে মেয়ের বিয়েটা বেশ ধুমধাম করে হোক। লোকেদের প্রায়ই বলতে শুনেছে, কাঙাল বৈরাগী আবার মেয়ের বিয়ে দেবে কি করে? বিয়ের জাঁকজমক দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে বলবে 'বৈরাগী কি অদ্ভুত লোক।' কোন ব্যাপারে কাউকেই সে ত্রুটি ধরার সুযোগ দেবে না।

ছিলিমটা পাশে রেখে বৈরাগী শুয়ে পড়ে। হালকা ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে। দেখে, জামাই ওকে খুব সম্মান করে, নিজের কাছে থাকবার জন্যে ডেকে পাঠায়।

জানা নেই রাত কত হয়েছে। হঠাৎ বারান্দায় সবাই চেঁচামেচি করে উঠে পড়ল। বৈরাগীও চমকে উঠে পড়ে। বারান্দায় আলো নেই। সবাই যে যার বাড়িমুখো চলেছে।

'কি হয়েছে রে?' বৈরাগী চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করে।

'সত্যি সত্যি পুলিশের বাঁশির আওয়াজ। হয়তো পাশের গলিটায় আছে।' বলতে বলতে একজন জুয়াড়ী ছুটে পালায়।

ছিলিম হাতে করে বৈরাগী ঘরের ভেতরে ঢোকে। চারদিক অন্ধকার। দেশলাই দিয়ে আলো জ্বালায়। মাদুরের ওপর একটা পয়সাও ছিল না।

'হ্যাঁরে সত্যম্? পয়সা কোথায়? বৈরাগী চিৎকার করে। হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে নিয়ে সে ভেতরে যায়। কোথাও সত্যম্‌কে সে দেখতে পায় না। 'বেটা বদমাইস, আলো নিভিয়ে পয়সা নিয়ে গেছে।' 'গৌরী মা' বলে এক ডাক দেয়। তাকেও কোথাও দেখতে পেল না।

'তালে কি গৌরীমা আমাকে ছেড়ে চলে গেল?' ভাবতে ভাবতে বৈরাগী পাগল হয়ে যায়। মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। আলো-আঁধারের চোখ বেঁধে যে বৈরাগী এতকাল লুকোচুরি খেলে এসছে আজ সে চোখে আর কিছু দেখতে পায় না। হ্যারিকেনটা যেখানেই থাকুক না কেন, এই অন্ধকার গুহা থেকে বেরুবার কোন পথই সে খুঁজে পায় না। আজ জীবনটা সত্যিই বিষাক্ত হয়ে উঠল।

অনুবাদ ইন্দ্রাণী সরকার

লেখক পরিচিতি

কথাকাহিনি ও *সুবর্ণরেখলু* (সুবর্ণরেখা) বোম্মিরেড্ডি পলিস্ন সূর্য রাও-এর গল্প-সংগ্রহ। তাঁর গল্প আকারে ছোট হলেও তেলুগু-গল্পের সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ আগস্ট

কিশোরকুমার

০১ আগস্ট ১৯৩২	❖	বলিউড অভিনেত্রী মীনাকুমারীর জন্ম
০২ আগস্ট ১৮৬১	❖	আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়ের জন্ম
০৪ আগস্ট ১৯২৯	❖	কিশোরকুমারের জন্ম
০৭ আগস্ট ১৮৬৮	❖	প্রমথ চৌধুরীর জন্ম
০৭ আগস্ট ১৯২৫	❖	কৃষিবিদ এমএস স্বামীনাথনের জন্ম
০৭ আগস্ট ১৯৪১	❖	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
১১ আগস্ট ১৯০৮	❖	ক্ষুদিরামের ফাঁসি
১২ আগস্ট ১৯১৯	❖	মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৮৭১	❖	ঋষি অরবিন্দের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৯২৬	❖	কবি কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৯৪৭	❖	ভারতের স্বাধীনতা দিবস
১৫ আগস্ট ১৯৪৭	❖	অভিনেতা রাখি গুলজারের জন্ম
১৬ আগস্ট ১৮৮৬	❖	রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মৃত্যু
১৮ আগস্ট ১৯৩৬	❖	হিন্দি গীতিকার পরিচালক গুলজারের জন্ম
২০ আগস্ট ১৯১২	❖	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম
২০ আগস্ট ১৯৪৪	❖	রাজীব গান্ধীর জন্ম
০২ আগস্ট ১৯২২	❖	বিমল মিত্রের জন্ম
২৩ আগস্ট ১৮৯৮	❖	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
২৮ আগস্ট ১৮৫৫	❖	স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম
২৯ আগস্ট ১৯৭৬	❖	কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু
৩১ আগস্ট ১৫৬০	❖	মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম

শেষ পাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালজয়ী কথাশিল্পী

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শক্তিমান কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের (অধুনা পশ্চিমবঙ্গের) বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে। তাঁর পিতার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা প্রভাবতী দেবী।

১৯১৬ সালে স্থানীয় যাদবলাল হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তারাশঙ্কর প্রথমে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরে সাউথ সাবারবার্ন (এখনকার আশুতোষ) কলেজে ভর্তি হন। কলেজজীবনেই তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তাঁর স্ত্রীর নাম উমাশশী। এ দম্পতির সনৎ ও সরিৎকুমার নামে দুই পুত্র এবং গঙ্গা, বুলু (অকালপ্রয়াতা) ও বাণী নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ্ন দানের অপরাধে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলে তিনি সাউথ সাবারবার্ন কলেজে ভর্তি হন কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। কারাগারেই তাঁর ভাবান্তর ঘটে। বছরখানেক পর মুক্তি পেয়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩২ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি* প্রকাশিত হয়। উপন্যাস হাতে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। সেই সাৰাৎ আদতে ছিল গুরুদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা।

এরপর একে একে *পাষাণপুরী, নীলকান্ত, রাইকমল, প্রেম ও প্রয়োজন, আগুন, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, মন্বন্তর, কবি, বিংশ শতাব্দী, সন্দীপন পাঠশালা, ঝড় ও ঝরাপাতা, অভিযান, পদচিহ্ন, উত্তরায়ণ, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজ ও রাঢ়বঙ্গের নিখুঁত জীবনচিত্র পড়ে পাঠককুল রীতিমত বিহ্বল রোমাঞ্চিত মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। এ সময়কালে তিনি অনেকগুলি স্মরণীয় গল্পও রচনা করেন।

তিনি প্রচলিত উপন্যাসের লালিত্য ভেঙে তাঁকে বাস্তবের শক্ত জমিতে দাঁড় করান। সামাজিক টানাপড়েনের প্রেক্ষাপটে মানবিক সম্পর্কের গভীরে আলোকপাত করাই ছিল তাঁর কাজ। তাঁর কলম সমাজের রক্ষণশীলতা ও ভণ্ডামির বেড়াজাল ভেঙে সত্য উদ্‌ঘাটনে সতত তৎপর ছিল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সমাজকে দেখেছেন। তিনি এমন এক সময়ে লিখতে শুরু করেন যখন সামন্তবাদী সমাজকাঠামো ভেঙে পড়ছে, গড়ে উঠছে শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতা। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের জীবনকাহিনি উপজীব্য করে রচিত *জলসাঘর* এই ভাঙচুরের বিশ্বস্ত প্রতিলিপি। তারাশঙ্করের বিশেষত্ব এই, কল্পনা নয়– যা দেখেছেন তিনি তাই নিখুঁতভ াবে তুলে ধরেছেন।

১৯৪০ সালে বাগবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করে তারাশঙ্কর লাভপুর ছেড়ে সপরিবারে কলকাতা চলে আসেন। ১৯৪১ সালে বাগবাজার ছেড়ে বরানগরে চলে যান। ১৯৪২ সালে বীরভূম জেলার সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলার লালমাটি আর তার মানুষকে নিপুণ দক্ষতায় উপস্থিত করেছেন তাঁর সাহিত্যে। জমিদার বাড়ির সন্তান বলেই হয়তো জমিদারদের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বিশেষ স্থান পায়। এটি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এর প্রতিফলন দেখা যায় *গণদেবতা, মন্বন্তর, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, ডাক হরকরা, আরোগ্য নিকেতন, কবি, কীর্তিহাটের কড়চা* প্রভৃতি অনবদ্য রচনায়। তাঁর রচনায় বীরভূমবর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, বেদ্নে বেদেনী, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায় তথা সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ছোট বা বড় যে ধরনের মানুষই হোক না কেন, সমাজে তার গুরুত্ব যাই থাক না কেন, তারাশঙ্কর তাঁর সব লেখায় মানুষের মহত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন, যা তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। সেখানে আরো রয়েছে জীবনের ভাঙ্গনের কথা, নগরজীবনের বিকাশের কথা।

তারাশঙ্করের সাহিত্যকীর্তি বিপুল। প্রায় চল্লিশ বছরের সাহিত্যিকজীবনে তিনি ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি গল্প সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ সংকলন, ৪টি আত্মজীবনী ও ২টি ভ্রমণকাহিনি লিখে গেছেন। তাঁর রচনার বিপুল বৈভব বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে তিনি ক্রমে সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হতে শুরু করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শরৎস্মৃতি পদকে ভূষিত করে। ১৯৫২ সালে তিনি বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। এরপর ভারতের রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ করেন। *আরোগ্য নিকেতন* উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সালে তাঁকে রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত করে। পরের বছর লাভ করেন সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার। ১৯৫৭ সালে চিন সরকারের আমন্ত্রণে চিন ভ্রমণে যান, পরের বছর ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে যান সোভিয়েত ইউনিয়নে আফ্রোএশীয় লেখক সমিতির আমন্ত্রণে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। *গণদেবতার* জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৬ সালে। দেশেবিদেশে নানা পুরস্কার সম্মানে ভূষিত তারাশঙ্করকে ভারত সরকার পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৭১ সালে বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যথাক্রমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও ডি এল রায় স্মারকবক্তৃতা দান করেন। এবছরেরই ১৪ সেপ্টেম্বর ভোরে কলকাতায় নিজ বাড়িতে এই কালজয়ী কথাশিল্পীর মৃত্যু হয়। বিশ্বশ্রুত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর *জলসাঘর* ও *অভিযান* নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

বাড়ি ২৪, সড়ক ২
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫

সাল ২০১৫
সময়কাল সন্ধ্যা ৬.৩০

১৮ জুলাই ২০১৫ রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে বাংলাদেশের নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার পঙ্কজ সরনের পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময়

১৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে হাই কমিশনার পঙ্কজ সরনের পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় ॥ ২৫ জুলাই ভারতের দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে বাংলাদেশের বেলায়েত হোসেনের আবৃত্তি

২৪-২৫ জুলাই বাংলাদেশে ইন্ডিয়া এডুকেশন ফেয়ারের উদ্বোধন করছেন হাই কমিশনের শিক্ষাবিষয়ক প্রথম সচিব জে পি মুখার্জি ॥ ভারতের উচ্চশিক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাস্যোজ্জ্বল কয়েকটি মুখ

২৪ জুলাই আইজিসিসি মিলনায়তনে ভারতের অর্ণব ভট্টাচার্যের সরোদবাদন ॥ ৪ মে- ২৯ জুন ২০১৫ চেন্নাই-এর এনআইটিটিটিআর-এ বাংলাদেশের শিক্ষকদের প্রথম ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠান

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra August 2015

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।
আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:
১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯
০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্তক যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত